'প্রহেলিকা সিরিজে'র ৪৩নং গ্রন্থ

প্রাণ নিয়ে খেলা
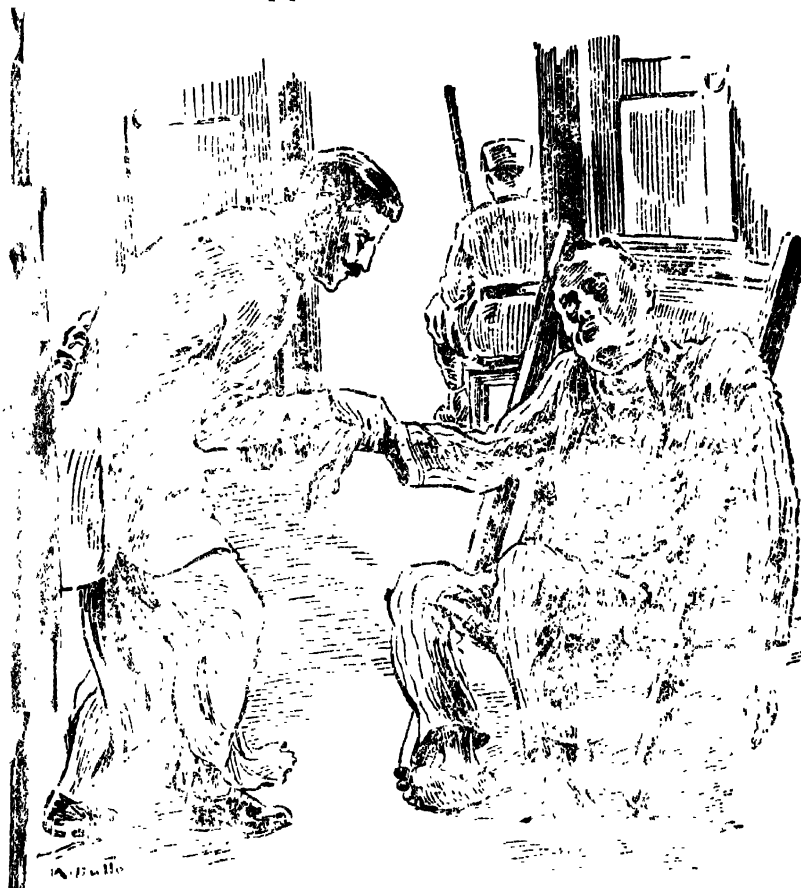
মুরারিমোহন বিট্

দেব সাহিত্য কুটীর

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর প্রাইভেট্ লিমিটেড,
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

অগস্ট
১৯৬১

ছেপেছেন—
এস্. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস,
২৮, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

উপহার

—উৎসর্গ—

পরমারাধ্যা মাতৃদেবী শ্রীযুক্তা রাজলক্ষ্মী বিটের শ্রীচরণে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি উৎসর্গ করিলাম।

১৩ই বৈশাখ
সন ১৩৬০ সাল

মুরারি

—নিবেদন—

আমার রচিত প্রথম রহস্যোপন্যাস "দস্যু টাইগারে"র পর দ্বিতীয় রহস্যোপন্যাস "প্রাণ নিয়ে খেলা" ছাপা হলো। দেব সাহিত্য-কুটীরের পূজনীয় শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও সাহায্যেই বইটি প্রকাশলাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছে। সেজন্য তাঁর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

চারিচারা পাড়া
নবদ্বীপ

মুরারিমোহন বিট্

প্রাণ নিয়ে খেলা

এক

নির্মম নিয়তি

প্রসিদ্ধ মোটর-ব্যবসায়ী প্রমথেশ সান্যালের তিনতলা বসত-বাড়ী। সামনে লোহার রেলিংএ ঘেরা প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড। ফটক থেকে লাল কাঁকর-বিছানো একফালি পথ কম্পাউণ্ডের বুকের ওপর দিয়ে সোজা চলে গেছে বাড়ীর গাড়ী-বারান্দা পর্যন্ত।

আশ-পাশের বাড়ীর তুলনায় প্রমথেশবাবুর বাড়ীখানা একটু ছোট; কিন্তু আকারে ছোট হলেও মানে-মর্যাদায় অনেক বড়। বাড়ীর মালিক ধনকুবের।

সন্ধ্যা সাড়ে ছটা থেকে সাতটার মধ্যেই সাধারণতঃ প্রমথেশবাবু কারখানা থেকে বাড়ী ফেরেন। বাড়ী ফিরে এক পেয়ালা চা বা কোকো এবং কিছু খাবার খেয়ে দোতলার অফিস-ঘরে গিয়ে বসেন। সেই ঘরে বসে হিসাব-নিকাশ নিয়ে রাত দশটা পর্যন্ত তাঁর একান্তে কাটে। কোন-কোন দিন সাড়ে দশটাও বাজে। কিন্তু সাড়ে দশটার বেশী কখনো নয়। তারপর এগারোটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া সেরে বিছানায় আশ্রয় নেন।

অকস্মাৎ আজ সে-নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলো। এগারোটা বেজে

গেছে, অথচ তিনি নামেননি। দশ বছরের ছোট ছেলে তপুকে ডেকে প্রমথেশের স্ত্রী উমা বললেন, ওঁকে বলগে তো তপু··· এগারোটা বেজে গেছে—কখন খাবেন!

মায়ের কথায় তপু গেল বাপের অফিস-কামরায়। গিয়ে দেখে, চেয়ারে বসে লিখতে লিখতে টেবিলের ওপর মাথা রেখে বাবা ঘুমিয়ে পড়েছেন! ডান হাতখানা খোলা খাতার উপর পড়ে আছে, আর সে-হাতে একটা ফাউণ্টেনপেন। ঘুমন্ত বাবাকে ডাকবে, এমন সাহস তপুর নেই! ফিরে এসে মাকে সে জানালো খবর।

তপুর কথা শুনে উমা আপনমনে বলে উঠলেন,—আচ্ছা মানুষ যা হোক! ঘুমোবে, তা ওখানে কেন? খেয়ে-দেয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে ঘুমোও না!

এবার মেজ ছেলে শুভেন্দুকে ডেকে তিনি বললেন,—অফিস-ঘরে কাজ করতে করতে উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন, ডেকে নিয়ে আয় তো! এগারোটা বেজে গেছে!

শুভেন্দু অফিস-ঘরে এসে ধীর কণ্ঠে ডাকলো,—বাবা···

ঘুমটা বেশ গাঢ় বোধ হয়। কোন সাড়া পাওয়া গেল না প্রমথেশবাবুর কাছ থেকে।

কাছে এসে জোর গলায় আবার ডাকলো শুভেন্দু,—বাবা!···

এবারও কোন সাড়া নেই।

—বাবা···বাবা···

প্রমথেশবাবু নীরব!

চারিদিক নিস্তব্ধ। কেমন যেন অস্বস্তি! বাবার ঘুম তো এক-ডাকেই ভাঙ্গে! আজ তাঁর ঘুম ভাঙ্গছে না কেন?

আরও কাছে এগিয়ে প্রমথেশবাবুকে স্পর্শ করে সে আবার ডাকলো,—বাবা…বাবা…উঠুন, অনেক রাত হয়ে গেছে !

তবু সাড়া নেই ! ঘুম ভাঙ্গাবার জন্য জোরে একটু ঠেলা…

সঙ্গে সঙ্গে প্রমথেশবাবুর দেহ চেয়ার থেকে সশব্দে মেঝের ওপর পড়ে গেল ! শুভেন্দুর মনে হলো, সে যেন আর নিজের মধ্যে নেই… চোখে তার পলক পড়ে না !…বিস্ফারিত চোখ দুটো প্রমথেশবাবুর ওপর গভীরভাবে নিবদ্ধ !

তারপরই শুভেন্দুর মাথাটা কেমন যেন ঝিম্‌ঝিম্ করে উঠলো। তার মনে হতে লাগলো, চতুর্দিক যেন ঘুরছে। একবার চকিতের জন্য সে ভাবলো, ভূমিকম্প হচ্ছে নাকি ? পৃথিবী কি রসাতলে যাচ্ছে ? তারপর…তারপর আর কিছু সে ভাবতে পারলো না…মাথা ঘুরে পড়ে গেল বাপের দেহের পাশে !

নিস্পন্দ…মূর্চ্ছাহত।

আধঘণ্টা পরের কথা।

প্রমথেশবাবুর সমগ্র বাড়ীখানা আলোয় আলোকীর্ণ ! গাড়ী-বারান্দার নীচে অনেকগুলো মোটর-গাড়ী। বাড়ীতে বহুলোক এসেছে। এলেও নিস্তব্ধ বাড়ীখানা !—প্রাণের স্পন্দন নেই যেন ! প্রমথেশ-বাবুর সঙ্গে সঙ্গে সকলের চোখেই যেন কাল ঘুম নেমে এসেছে !

পিঁ-ই-ই-ক্…পিঁ-ই-ই-ক্…

আর একখানা মোটর এসে দাঁড়ালো গাড়ী বারান্দার নীচে। গাড়ী থেকে নামলেন দুজন ভদ্রলোক—অনুপ সেন এবং রবি গুপ্ত।

ফটক খোলাই ছিল। রবিকে নিয়ে অনুপ সেন বারান্দায় উঠতেই এক ভৃত্যের সঙ্গে দেখা। ভৃত্য তাঁদের নিয়ে এলো বৈঠকখানা-ঘরে। সেখানে শুভেন্দু এবং আর দুজন ভদ্রলোক বসেছিলেন। অনুপকে দেখে শুভেন্দু উঠে দাঁড়ালো···বললো,—আসুন!

সেন বললেন,—এখানে নয়, আগে ডেড্‌বডির কাছে নিয়ে চলো আমাকে। ডেড্‌বডি না দেখা পর্যন্ত অন্য কিছু···

শুভেন্দু বললো,—এঁদের পরিচয়টা আগে দিয়ে দিই অনুপবাবু। এঁরা দুজনেই বাবার বন্ধু···এঁর নাম দেবব্রত রায় চৌধুরী, আর ইনি তারাচরণ চট্টোপাধ্যায়। বাবার মতো এঁরাও বড় বড় মোটর-কারবারের মালিক। আপনাকে যখন ফোনে খবর জানাই, তখন এঁদেরও খবর দিয়েছিলাম।

সেন ওঁদের দুজনের দিকে চেয়ে বললেন,—আপনাদের সঙ্গে আলাপে খুশী হলাম। নমস্কার।

ও-পক্ষ থেকেও নমস্কার এলো।

এরপর সবাই মিলে চলতে লাগলেন অফিস-কামরার দিকে। কামরার সামনে এসে শুভেন্দু বললো,—এই ঘরে!

শুভেন্দুর দিকে চেয়ে সেন বললেন,—আচ্ছা, এঁদের নিয়ে এখানে একটু দাঁড়াও। আমরা দেখে আসি ব্যাপারটা কি?

রবিকে নিয়ে তিনি অফিস-ঘরে ঢুকলেন।

ঘরের ঠিক মাঝামাঝি মেঝের উপরে পড়ে আছে প্রমথেশবাবুর দেহ! সুদর্শন···সুপুরুষ···স্বাস্থ্যের লাবণ্য এতটুকু মলিন হয়নি। মুখে-চোখে বীভৎসতার এতটুকু ছায়া নেই! আতঙ্কের কোন চিহ্ন নেই!···আশ্চর্য!···দেখে মনে হয়, আরামে ঘুমোচ্ছেন যেন!

কিন্তু বিশেষভাবে লাশ পরীক্ষা করে সেন বুঝতে পারলেন, কোন উগ্র বিষের ক্রিয়াতেই মৃত্যু ঘটেছে প্রমথেশবাবুর। বিষের ক্রিয়া বেশ দ্রুত! দেহের রক্তে বিষ মেশবার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটেছে! এতটুকু যাতনা অনুভব করেননি। যন্ত্রণা হলে চোখে-মুখে এমন স্বাভাবিকভাব থাকতো না। রাত্রি নটা থেকে দশটার মধ্যেই ভদ্র-লোকের মৃত্যু ঘটেছে।

এবার সেনের প্রধান কর্তব্য হলো, বিষটা কিভাবে তাঁর দেহে প্রবেশ করছে, তা আবিষ্কার করা।

লাশটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর তিনি ঘরের ভিতরটা পরীক্ষা করতে আরম্ভ করলেন। ঘরের একপাশে দুটো আলমারি, মাঝখানে একখানা টেবিল আর কয়েকখানা চেয়ার। আলমারি দুটো আর টেবিলটা ভালো করে দেখলেন। আলমারি এবং টেবিল নানা রকম খাতা, বই, আর কাগজপত্রে বোঝাই। সে-সবে এতটুকু বিশৃঙ্খলা নেই।

আরও কিছুক্ষণ ঘরটার এদিক-ওদিক দেখে রবিকে নিয়ে সেন আফিস-ঘর থেকে বেরুলেন। বেরিয়ে দেবব্রতবাবু আর তারাচরণ-বাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন,—চলুন, বৈঠকখানায় গিয়ে বসি।··· এসো শুভেন্দু।

বৈঠকখানায় এসে সকলে আসন গ্রহণ করার পর সেনকে শুভেন্দু প্রশ্ন করলো, -কি বুঝলেন?

সেন বললেন,—যা বুঝছি, এখন থাক, পরে বলবো। এখন শুধু এইটুকু জানিয়ে রাখছি, তোমার বাবাকে বিষ দিয়ে হত্যা করা হয়েছে!

—বিষ!—

প্রত্যেকেই অস্বাভাবিক রকমের চমকে উঠলেন। প্রমথেশবাবুকে হত্যা করা হয়েছে, একথা একটি মুহূর্তের জন্যও কেউ কল্পনায় আনতে পারেননি। কিছুদিন যাবৎ উনি ব্লাডপ্রেসারে ভুগছিলেন। যদিও সেরকম বাড়াবাড়ি কোনদিনও হয় নি, এবং ডাক্তারেও সেরকম কিছু বলেন নি, তথাপি প্রত্যেকেই ধারণা করেছিলেন যে, নিশ্চয় ঐ ব্লাড-প্রেসারের জন্যই হঠাৎ এরকম···

সেন বললেন,—হ্যাঁ, বেশ কড়া বিষ! রক্তের সঙ্গে মেশা মাত্র মৃত্যু ঘটেছে।

একটু থেমে তিনি আবার বললেন,—আচ্ছা শুভেন্দু, তুমি তখন ফোনে আমাকে ডাক্তারের কথা বলছিলে, ডাক্তারকে খবর দিয়েছো নাকি?

—না, আপনি তো ডাক্তারবাবুকে খবর দিতে নিষেধ করলেন, তাই আর তাঁকে খবর দিইনি। আমি দেখেছি, কোন বিপদে-আপদে বাবা সর্বাগ্রে আপনাকেই খবর দিতেন, এবং আপনার পরামর্শ মতই কাজ করতেন।

সেন বললেন,—ডাক্তারকে তখন খবর দিতে নিষেধ করেছিলাম এইজন্য যে, তিনি এসেই তো লাশটাকে নাড়াচাড়া সুরু করবেন··· তাতে আমার কাজের অসুবিধা হবে—এই আর কি! যাই হোক, এখন যদি তোমাদের ইচ্ছা হয়, ডাক্তারকে খবর দিয়ে আনাতে পারো।

শুভেন্দু প্রশ্ন করলো,—তার কোন প্রয়োজন আছে কি?

—না, কোন প্রয়োজনই নেই আমার মতে। পোষ্ট-মর্টেমের পর সমস্ত খবর বিশদভাবে পাওয়া যাবে।

তারপর সহসা বলে উঠলেন,—চলো তো শুভেন্দু, আর একবার অফিস-ঘরে! দরকার আছে।…তুমি এখানেই অপেক্ষা করো রবি, এখনি আসছি।

শুভেন্দুকে নিয়ে সেন ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

অফিস-ঘরে ঢুকে সেন সোজা প্রমথেশবাবুর প্রাণহীন দেহটার কাছে এগিয়ে এলেন। শুভেন্দু দরজার বাহিরেই দাঁড়িয়ে রইলো তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী।

মৃতের মুখ ছিল বন্ধ—শুধু ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দাঁতের একটুখানি অংশ দেখা যাচ্ছে।

সেন সেখানে হাঁটুগেড়ে বসে সেকেণ্ড কয়েক মৃতের মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন লক্ষ্য করলেন! তারপর দুহাত দিয়ে জোর করে বন্ধ মুখ করলেন ফাঁক—হাঁ করালেন। মাথার ওপর উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে, সে আলোয় মুখের মধ্যে সোজাসুজি দেখতে লাগলেন। কি যেন নজরে পড়লো মুখের মধ্যে!

মুখ-গহ্বর থেকে তখনি টেনে বার করলেন এক টুকরো লজেঞ্জ!

তারপর একটা পিঁপড়ে ধরে লজেঞ্জের টুকরোটা সেই পিঁপড়ের সামনে ধরলেন। খাবার পেয়ে পিঁপড়ে তাতে মুখ দিলো। মুখ দেওয়ার পরক্ষণেই তার মৃত্যু!…

সেন বুঝলেন, এই লজেঞ্জই প্রমথেশ সান্যালকে ওপারে পৌঁছে দিয়েছে!—কিন্তু কেন?…কে এই লজেঞ্জ দিলো? কখন দিলো? নানা প্রশ্ন মনে জাগে তাঁর।

লজেঞ্জের ব্যাপার শুভেন্দু টের পেলো না। সেন এ ব্যাপার শুভেন্দুর কাছে গোপন রাখবার জন্যই তার দিকে পিছন ফিরে কাজ করছিলেন।

শুভেন্দুর অলক্ষ্যে লজেঞ্জটা কাগজের মোড়কে পুরে পকেটে রাখলেন, তারপর শুভেন্দুর দিকে এগিয়ে এসে বললেন,—একটু জল আর সাবান চাই যে, হাতটা পরিষ্কার করতে হবে।

—আসুন।

শুভেন্দুর সঙ্গে বাথরুমে গিয়ে সেন ভাল করে হাত ধুয়ে আবার অফিস-ঘরে এলেন। টেবিলের ওপরেই ছিল টেলিফোন। রিসিভার তুলে থানায় খবর পাঠালেন। পুলিশের সঙ্গে তাঁর রীতিমত জানা-শোনা আছে —তার কারণ, অনুপ সেন প্রাইভেট ডিটেকটিভ। এ-কাজে তাঁর বিলক্ষণ পটুতা আছে বলে পুলিশ অনেক সময় তাঁর সঙ্গে অনেক কেসে পরামর্শ করে, সাহায্য চায়। এ-কাজে রবি তাঁর প্রধান সহকারী।

ফোন করা হয়ে গেলে সেন প্রশ্ন করলেন,—তোমার বাবা আজ অফিস থেকে ফিরেছেন ক'টায়?

—তখন সাতটা হবে।—শুভেন্দু বললো।

—তাঁকে তখন দেখেছিলে?

—হ্যাঁ।

—কেমন দেখেছিলে? রোজ যেমন দেখো?

শুভেন্দু বেশ একটু বিস্মিত হয়ে বললো,—আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না!

—অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি যে, সে-সময় তাঁর স্বাভাবিক

অবস্থার কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলে কি ? কোন রকম চিন্তিত বা অন্যমনস্ক ভাব ?

—আজ্ঞে না ; রোজ যেমন দেখি, তেমনিই দেখেছিলাম। কোন রকম ব্যতিক্রম আমার চোখে পড়েনি। কেন বলুন তো ?

সে-কথার কোন জবাব না দিয়ে সেন অন্য প্রশ্ন সুরু করলেন,—আচ্ছা, উনি বাড়ী ফিরে এলে কেউ ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল কি না, বলতে পারো ? মানে, সাতটা থেকে এগারোটা—এই সময়ের মধ্যে কেউ এসেছিল কি না ওঁর কাছে ?

—না, কেউ আসেনি।

—বেশ ভেবে-চিন্তে উত্তর দাও। আমার এই প্রশ্নের ওপর, এবং তোমার সঠিক জবাবের ওপর অনেক কিছুই নির্ভর করছে শুভেন্দু, একথা খেয়াল রেখো।

এবার সত্যিই শুভেন্দু একটু চিন্তা করলো। তারপর বললো,—না, কাকেও আসতে দেখিনি। আমার পড়ার ঘরটা দেখেছেন তো··· নীচে ঐ সিঁড়ির পাশে ? সন্ধ্যা থেকে দশটার পর পর্যন্ত আমি ওখানে ছিলাম। কেউ এলে নিশ্চয় চোখে পড়তো।

সেন বললেন,—তুমি পড়াশুনা করছিলে তো ?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

সেন হেসে বললেন,—কাজেই কেউ এলো কি না, সেদিকে তোমার খেয়াল না থাকা স্বাভাবিক। তুমি বরং বাড়ীর মধ্যে গিয়ে সকলকে একবার জিজ্ঞাসা করে এসো। চাকর-বাকর···মানে, সব লোককে জিজ্ঞাসা করবে। আমি এখানেই রইলুম। যাও—

অল্প সময়ের মধ্যেই ফিরে এসে শুভেন্দু বললো,—না অনুপবাবু, কাকেও আসতে দেখেনি কেউ। প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসা করেছি। তাছাড়া ওরা দেখবেই বা কেমন করে বলুন? ওরা সাধারণতঃ বাড়ীর মধ্যেই থাকে।

সেন ভাবলেন একটু, তারপর শুভেন্দুকে সতর্ক করে দিলেন—তোমার সঙ্গে যে-কথা হলো, বাইরের কোন লোক যেন টের না পায়···বুঝলে?

শুভেন্দু ঘাড় নেড়ে জানায় যে, সে বুঝেছে।

সেনের মুখ গম্ভীর···চিন্তায় আচ্ছন্ন····

বৈঠকখানায় এসে বসতে তারাচরণবাবু আর দেবব্রতবাবু তাকালেন সেনের পানে···সপ্রশ্ন দৃষ্টি।

দেবব্রতবাবু বললেন,—কিছু বুঝলেন?

—না, সঠিক কিছু বুঝে উঠতে পারিনি।

কথাটা বলে সেন চুপ করলেন······সিলিং-এর দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবতে লাগলেন আকাশ-পাতাল। দেওয়ালের বড় ঘড়িটায় টক্-টক্ শব্দ। লম্বা পেণ্ডুলামটা একতালে দুলছে।

সিলিং থেকে দৃষ্টি নামিয়ে সেন পেণ্ডুলামটার দিকে চেয়ে থাকেন। এত দুলেও পেণ্ডুলামটা কোনদিনের জন্যও পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে না··· আশ্চর্য! কথাটা মুহূর্তের জন্য একবার ভেবেই সেন মৃদু হাসলেন। কি ছেলেমানুষী চিন্তা!

সাড়ে বারোটা বেজে গেছে।

ভেতর-মহল থেকে মাঝে মাঝে একাধিক মেয়ে-পুরুষের মৃদু-গুঞ্জন কানে আসছে। আর আসছে নারী-কণ্ঠের ক্ষীণ বিলাপ।

সেনের ধ্যানগম্ভীর মূর্তির দিকে চেয়ে দেবব্রতবাবু, তারাচরণবাবু, শুভেন্দু -কেউ আর কোন কথা বলতে পারে না; চুপ-চাপ বসে থাকে, আর এক-একবার বক্রনয়নে তাকায় তাঁর দিকে।

ঠিক এইরকম একটা নির্বিকার পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া রবির কোনদিনই ধাতে সয় না। তাই সে একটা সিগারেট ধরিয়ে জানালার দিকে এগিয়ে যায়।

মাঝ রাতের এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া তার মুখ-চোখের ওপর ঝাপ্‌টা মেরে ওপাশ দিয়ে ঘুরে বেরিয়ে গেল।...সিগারেটের মুখে জমে ওঠা ছাইটুকু ঝরে পড়লো নীচে।

অনেকক্ষণ পর সেন কথা বললেন। দেবব্রতবাবুর দিকে চেয়ে বললেন,—দিন চারেক পর আপনাদের যাহোক কিছু একটা খবর দিতে পারবো বলে আশা করছি।

দেবব্রতবাবু বললেন,—দেখুন, খবর নেওয়াটা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি চাই, যত তাড়াতাড়ি পারেন, এর একটা বিহিত-ব্যবস্থা করুন। আপনার নাম শুনেছি...শুনেছি আপনি অসাধ্য-সাধন করতে পারেন!

সেন বললেন,—ভার যখন নিয়েছি, চেষ্টার ত্রুটি হবে না।

—ব্যস্‌, ব্যস্‌, ওতেই যথেষ্ট! আমার বিশ্বাস, চেষ্টা করলে আপনি নিশ্চয়ই সাকসেসফুল হবেন।

দেবব্রতবাবু যেন আশ্বস্ত হলেন।

তারাচরণবাবু বললেন,—আমি কিন্তু আশ্চর্য হচ্ছি মিস্টার সেন,

হঠাৎ এমন বিনামেঘে বজ্রাঘাত হলো কেন? প্রমথেশবাবুর মত অমায়িক লোক দেখা যায় না।

দেবব্রত শুধালেন,—খুনের হেতু কিছু বুঝলেন? কোন কিছু চুরির মতলব?

সেন বললেন,—না, আমার বিশ্বাস কিছু চুরি যায়নি।

—তাহলে? এ সম্বন্ধে আপনার কোন ধারণা আছে?

—না, কিছু ঠাওরাতে পারছি না! এখন সবই ধোঁয়া দেখছি। আসামী চতুর! বেশ খানিকটা বেগ পেতে হবে আমাদের!

সেন চুপ করলেন।

ঢং……

ঘড়ি বাজলো।

সেন ঘড়ির দিকে একবার তাকালেন; তারপর বললেন,—আর নয় শুভেন্দু, আমাকে এবার উঠতে হবে! অন্য কাজ আছে। পুলিশ আসছে। সব দেখবে। সকলকে যা জিজ্ঞাসা করবে, যেন জবাব পায় …যে যা জানে, সব যেন বলে। আর ডেড্‌বডি নিয়ে যাবে তারা। উপায় নেই…এটুকু সহ্য করতেই হবে। আমি আবার কাল সকাল আটটা নাগাদ আসবো।

তারাচরণবাবু বললেন,—আমরাও উঠি।

দেবব্রতবাবুও উঠলেন।

তিনজনেই বাইরে এলেন…এসে যে যার মোটরে।

তিনখানা গাড়ী রওনা হলো এক সঙ্গে।…

দুই

সেনের প্রশ্ন
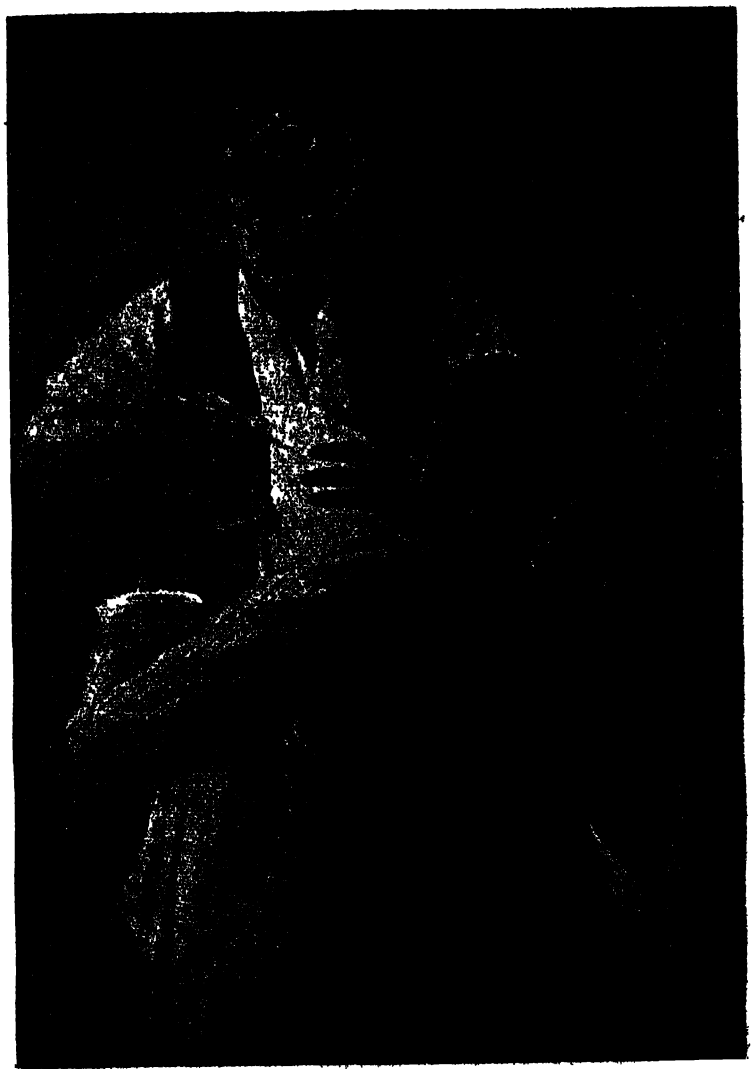
পরদিন সকালে প্রাতঃরাশ শেষ করে সেন তাঁর মোটর নিয়ে বেরুলেন। যাবার সময় রবিকে বলে গেলেন, প্রমথেশবাবুর ওখানে যাচ্ছেন, ফিরতে প্রায় ঘণ্টা খানেক দেরি হবে।

রবি বললো,—তথাস্তু! একঘণ্টার জায়গায় যদি দু ঘণ্টা দেরি হয়, কিংবা আজ যদি একেবারে নাও ফেরো, তাহলেও আমি কিছুমাত্র বিচলিত হবো না!

সেন হেসে বললেন,—যদি জন্মের মতোই না আসি?

—অর্থাৎ?

—ধরো, যদি আমার মোটরের সঙ্গে অন্য কোন গাড়ীর একটা বড় রকমের অ্যাক্সিডেণ্ট্ হয়ে যায়, এবং তাতে……

রবি বললো,—আমি জানি, যতক্ষণ তোমার হাতে স্টিয়ারিং হুইল থাকবে, ততক্ষণ কোন অ্যাক্সিডেণ্টের ভয় নেই। কিন্তু আমার কি আশঙ্কা হচ্ছে জানো অনুপদা? আমার আশঙ্কা হচ্ছে, প্রমথেশবাবুর ওখানে গিয়ে হঠাৎ আততায়ীর সন্ধান পেয়ে তার পিছু পিছু যেন কোন তেপান্তরে পাড়ি না জমাও!

সেন হাসলেন; হেসে মোটরে উঠে স্টার্ট দিলেন।

শুভেন্দু ড্রয়িংরুমেই বসে ছিল সেনের অপেক্ষায়। আরও একজনকে দেখা গেল। লোকটার বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। পরনে দামী সুট, গায়ে সিল্কের গেঞ্জী, বেশ ফর্সা গায়ের রং। চমৎকার

মুখশ্রী। টানা টানা দুটো চোখ। কিন্তু, ঈষৎ চঞ্চল চোখের তারা দুটি চতুর ও অস্থির মনের পরিচায়ক।

সেন একনজরেই এগুলো দেখে নিলেন। শুভেন্দু পরিচয় করিয়ে দিল,—ইনিই আমার বড় ভাই।

—ওঃ! আপনিই সুব্রতবাবু? টালিগঞ্জে থাকেন তো?

—হ্যাঁ।

—আপনার কথা শুভেন্দুর মুখ থেকে এবং আপনার বাবার মুখ থেকে শুনেছি কতদিন, কিন্তু এই প্রথম সাক্ষাৎ। নমস্কার।

সুব্রতও প্রতি নমস্কার জানায়।

প্রমথেশবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র সুব্রত, মধ্যম শুভেন্দু, আর কনিষ্ঠ তপু ওরফে তপন। তপন ও শুভেন্দুর মাঝে দুটি মেয়ে। প্রমথেশবাবু সুব্রতকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন বছর চারেক আগে। এই চার বছর ধরে সে বাস করছে টালিগঞ্জে। এর মধ্যে সে আর এ-বাড়ীতে পা দেয়নি কোনদিন; প্রমথেশবাবুও ছেলেকে ডাকেননি কোনদিনের জন্যও।

ত্যাজ্যপুত্র করার কারণটা সংক্ষেপে এই:

সেবার প্রমথেশবাবু কোনও এক বিশেষ কাজে দিন চারেকের জন্য এলাহাবাদে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর একজন ছোট-বেলাকার বন্ধু থাকতেন। সেই বন্ধুর বাড়ীতে উঠেছিলেন। যাবার আগে অবশ্য একখানা চিঠি দিয়ে তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, অমুক দিন তিনি যাচ্ছেন।

বন্ধু অমরবাবু প্রমথেশকে পেয়ে তো মহাখুশী।

—ওঃ! কতদিন পর দেখা হল প্রমথেশ!

প্রমথেশবাবু বললেন,—সত্যি, অনেক দিন পর দেখা হল। তা প্রায় পাঁচ বছর দেখা হয়নি।

অতঃপর সুযোগমত অমরবাবু এক সময় বললেন,—কতদিন থেকে একটা কথা তোকে লিখবো লিখবো ভাবছি প্রমথেশ, কিন্তু লজ্জায় চিঠিখানা আর এ পর্যন্ত লিখে উঠতেই পারিনি।

—লজ্জা! সে আবার কি রে?

হো-হো করে হেসে ওঠেন প্রমথেশবাবু।

ব্যাপারটা হল এই যে, অমরবাবুর একটি বিবাহযোগ্যা কন্যা রয়েছে। তাঁর ইচ্ছা, প্রমথেশবাবুর বড় ছেলে সুব্রতর সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে দেন। মেয়েটি যে রূপে-গুণে-বিদ্যায়-বুদ্ধিতে কোন অংশেই হেয় নয় বা সুব্রতর অনুপযুক্তা নয়, একথা জোর করেই বললেন অমরবাবু।

অতঃপর মেয়েটিকে দেখলেন প্রমথেশ। দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। মেয়ে তো নয়—যেন সাক্ষাৎ দেবী প্রতিমা! এমন একটি মেয়েকে পুত্রবধূ-রূপে পাওয়া ভাগ্যের কথা!

প্রমথেশবাবু সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলেন, এবং পাকা কথা দিলেন যে, এ মেয়েকে তিনি গ্রহণ করবেন।

সুব্রত কিন্তু বেঁকে বসলো। সে বাবার মুখের ওপরই জবাব দিয়ে দিল যে, ও-মেয়েকে সে বিয়ে করবে না।

প্রথমটা প্রমথেশবাবু ভাবলেন যে, ছেলেকে না জানিয়ে পাকা-পাকি বিয়ের ব্যবস্থা করাতেই হয়ত ছেলের রাগ হয়েছে। তাই তিনি হেসে বললেন,—আচ্ছা তুই বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে মেয়ে দেখে আয়, যদি পছন্দ না হয় বিয়ে করিস নে, আমি কিচ্ছু বলবো না।

কিন্তু তবুও সুব্রতর মন নরম করা গেল না। প্রমথেশবাবু আরও

দু-একবার অনুরোধ করলেন, মা উমাদেবী বার বার অনুরোধ করলেন, কিন্তু সুব্রতর এক গোঁ—সে বিয়ে করবে না। এতেও হয়ত ধৈর্য থাকতো প্রমথেশবাবুর। কিন্তু, শেষে যখন সোজাসুজি সুব্রত বলে বসলো,—'আমি সন্দীপের বোন আরতিকে ছাড়া আর কাকেও বিয়ে করবো না'—তখনই তাঁর ধৈর্যের বাঁধ গেলো ভেঙে। প্রমথেশবাবুর চোখ দুটো হিংস্র বাঘের মতো জ্বলে উঠলো! এত দূর স্পর্ধা তাঁর ছেলের?

সেইদিনই তিনি ত্যাজ্যপুত্র করলেন সুব্রতকে। এবং বলে দিলেন, এই বাড়ীতে সে যেন আর কোনদিন প্রবেশ না করে, আর তাঁর সম্পত্তি থেকে একটি পয়সাও সে যেন আশা না করে! তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি উইল করে দেবেন তপু আর শুভেন্দুর নামে।

সামান্য দু-একটা কথা বলে সেন শুভেন্দুকে বললেন,—আমার একটা নিরিবিলি জায়গা চাই। আমি ছাড়া আর কেউ থাকবে না সে-ঘরে।

শুভেন্দু বললো,—বাবার অফিস-ঘরে কাজ চলবে?

—খুব ভালো হয় ও-ঘরটা পেলে।

—আসুন।

চলতে চলতে সেন শুধোলেন,—বর্তমানে কে কে থাকেন তোমাদের বাড়ীতে?

শুভেন্দু বললো,—আপনি তো জানেন সবই।

—মোটামুটি অবশ্য জানি। তুমি, তোমার ভাই তপন, দুই বোন, তোমার মা, পিসিমা, উড়ে বামুন একজন, আর চাকর সুন্দর···আর কে আছেন?

শুভেন্দু বললো,—আরও একজন চাকর নতুন কাজে লেগেছে, মাস চারেক হল। লোকটা একদিন খুব কেঁদে-কেটে এসে পড়েছিল বাবার কাছে—

—ওঃ। আর কেউ আছে ?

—হ্যাঁ, আর একজন ঝি আছে।

—তার নাম পরী, না ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আর ঐ নতুন চাকরটা, ওর নাম ?

—রতনলাল।

দুজনে এসে ঢুকলেন অফিসরুমে। একটা চেয়ারে বসে সেন বললেন,—তোমাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করবার আছে শুভেন্দু।

—বলুন ?

শুভেন্দু সেনের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাকালো। সেন প্রশ্ন করলেন,—তোমার বাবা কি কোন উইল করে গেছেন ?

—না।

—তোমার বাবার ইচ্ছা ছিল, তোমাকে এবং তপনকেই তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ভাগ করে দেবেন, সুব্রতবাবু কিছুই পাবেন না, একথা ঠিক ?

—হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন।

সেন বললেন,—কিন্তু এখন ব্যাপারটা হয়ে গেল অন্যরকম। যেহেতু তোমার বাবা উইল করে যাননি, সেহেতু সম্পত্তি তোমাদের তিন ভায়েরই প্রাপ্য।

শুভেন্দু শুধু বললো,—বোধ হয় তাই···ঠিক জানি না এসব আইন-কানুন।

সেন চুপ করে রইলেন একটু। তারপর আবার বললেন,—তোমাদের যে নতুন চাকরটা এসেছে, রতনলাল না কি নাম বললে—?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, রতনলাল।

—লোকটা কেমন?

—ভালই তো মনে হয়। বেশ সরল। নিতান্ত গোবেচারা—

সেন ঠোঁটের কোণে একটু অর্থপূর্ণ হাসি টেনে বললেন,—কিন্তু আমি যদি বলি, তুমি যা মনে করেছো, সেটা ভুল?—রতনকে তুমি চিনতেই পারোনি?—তাহলে কি জবাব দেবে?

শুভেন্দু হাঁ হয়ে যায়—কোন কথাই তার মুখ দিয়ে বের হয় না! কি বলতে চাইছেন সেন? তিনি এই কথার মধ্যে দিয়ে কিছু ইঙ্গিত করছেন কি?

সেন এবার খোলসা করেই হাসলেন। হেসে বললেন,—তুমি যে ঘাবড়ে গেলে দেখছি! কথাটা এমনিই বললাম—কোন কারণ নেই, বাজে কথা।

আশ্বস্ত হয় শুভেন্দু।

—অর্থাৎ তোমাকে আমি এই কথাটাই বলতে চাইছিলুম শুভেন্দু যে, মাত্র চার মাসের পরিচয়ে কোনও লোককে চেনা বা জানা যায় না। কোন লোককে ভালভাবে চিনতে হলে প্রচুর সময় লাগে। তার চলা-ফেরা, কথা-বার্তা ভাব-ভঙ্গি এবং দৈনন্দিন ঘটনাগুলি বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হয়। শুধু পর্যবেক্ষণ করলেই হবে না—রীতিমত গবেষণাও করতে হবে। কিন্তু এরকম কেউ করে না।

কাজেই তার বাইরের রূপটাই তোমরা দেখতে পাও। যথা: "রতন সরল ও গোবেচারা ব্যক্তি"। কিন্তু তার অন্তরটা ততখানি সরল না-ও হতে পারে। অবশ্য রতন যে খারাপ লোক, একথা আমি বলছি না। তোমাকে এইটুকু বলাই উদ্দেশ্য যে, কোন লোকের সম্বন্ধে এতো সহজে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো উচিত নয়। তাতে বিপদ হতে পারে।···আচ্ছা কাল রাতে তুমি যখন পড়ার ঘরে পড়ছিলে, তখন বাইরের কোন লোক সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠেনি, এই কথাই তো তুমি বলেছিলে?

শুভেন্দু বললো,—হ্যাঁ বলেছিলাম বটে; কিন্তু পরে আবার ভেবে দেখলাম পড়তে পড়তে দু-তিনবার বাড়ীর মধ্যেও গিয়েছিলাম। কাজেই ঠিক···

বাধা দিয়ে সেন বললেন,—আচ্ছা ওকথা থাক। রাত নটা থেকে দশটার মধ্যে তোমাদের ঝি-চাকরদের মধ্যে কেউ এঘরে এসেছিল কিনা বলতে পারো?

শুভেন্দু একটু চিন্তা করে বললো,—রতনকে যেন একবার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে দেখেছিলাম।

—ঠিক মনে আছে?

—না, সঠিক ভাবে কিছু স্মরণ করতে পারছি না।

এখানে বলে রাখা প্রয়োজন বোধ করি যে, যে সিঁড়িটার কথা হচ্ছে, এই সিঁড়ি দিয়ে কেবল প্রমথেশবাবুর অফিসরুমে এবং অফিস-রুম সংলগ্ন আর দুখানা ঘরে যাওয়া যায়। সে ঘর দুটোও তাঁর অফিস ও কারখানা-সংক্রান্ত কাজেই ব্যবহার করা হয়। প্রয়োজনের সময়টুকু ছাড়া ঘর দুখানা সব সময় তালা বন্ধ অবস্থাতেই থাকে।

মাত্র এই তিনটি ঘরের জন্য সিঁড়িটা তৈরি করা হয়েছে। ঘর তিনটির সঙ্গে অন্দরমহলের কোন ঘরেরই যোগাযোগ নেই। বাইরের অনেক লোক আসা-যাওয়া করেন। সেইজন্যই প্রমথেশবাবু অফিস-রুমটা এমন্ পৃথক্‌ভাবে তৈরি করেছেন। কাজেই এই সিঁড়ি দিয়ে যদি কেউ যাতায়াত করে, তাহলে বুঝতে হবে সে প্রমথেশবাবুব অফিস-রুমেই গিয়েছিল বা যাচ্ছে। এসব তথ্য সেনের বহু আগে থেকেই জানা আছে।

অতঃপর সেন শুধোলেন,—তোমার বড়দা এলেন কখন ?

—এই একটু আগে। খুব ভোরে উঠেই মোটর নিয়ে গিয়েছিলাম বড়দার বাড়ী। ঘণ্টাখানেক হল ফিরেছি।

সেন ভাবতে লাগলেন, আর কি প্রশ্ন করা যায় ? না, আপাততঃ আর কিছু জিজ্ঞেস করবার নেই। বললেন,—আচ্ছা তুমি এবার যাও ; গিয়ে রতনকে পাঠিয়ে দাও একবার। তাকে চিনতে পারি কি না, একটু চেষ্টা করে দেখবো।

শুভেন্দু চলে যায়।

তিন

অক্টোপাসের পণ

বাড়ী ফিরে হাত-মুখ ধুয়ে সেন সবে মাত্র তাঁর লাইব্রেরীরুমের ইজিচেয়ারটায় গা এলিয়ে দিয়েছেন, এমন সময় ভৃত্য গোকুল এসে খবর দিল,—ইন্‌স্পেক্টর সাহেব এসেছেন।

—ওঁকে নিয়ে আয় এখানে।

আদেশ পেয়ে বেরিয়ে গেল গোকুল।

একটু পরে ডিটেকটিভ-ইন্‌স্পেকটর রঞ্জন রায় আবির্ভূত হলেন। সেন তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন।

রঞ্জন রায় আসন গ্রহণ করলে সেন বললেন,—তারপর কি খবর, অনেক দিন দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি আপনার সঙ্গে।

রায় বললেন,—খবর যা, তা আপনার অজানা নয় মিস্টার সেন। আপনি তো দেখছেন, কলকাতার বুকে কি রকম উপদ্রব শুরু হয়েছে। আজ সকালে থানায় গিয়ে জানতে পারলাম প্রমথেশ সান্যালের ব্যাপারটা···আপনি তদন্তে গিয়েছিলেন তাও শুনেছি। কাগজেও পড়লাম সমস্ত ঘটনাটা···। এ ছাড়া আরও একটা ব্যাপার ঘটে গেছে কাল রাত্রে। আপনি জানেন নিশ্চয়ই?

—কি হয়েছে?

—কেন, আজকের কাগজ পড়েননি? কাগজে বেরিয়েছে তো।

—না, আজকের কাগজটা এখনও পড়ে উঠবার সময় পাইনি··· সকালটা নানা ঝামেলায় কাটলো। এতক্ষণে একটু সুস্থ হতে পেরেছি।

এই পর্যন্ত বলে সেন ডাক দিলেন গোকুলকে। গোকুল এলো। কৃত্রিম ক্রোধে তিনি বললেন,—কি করছিলি হতভাগা?

—আজ্ঞে, বারান্দায় ছিলুম।

—ইন্‌স্পেকটর-সাহেব এসেছেন খেয়াল নেই! একবারে আস্ত গরু একটি!

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

হাসলেন সেন, বললেন,—যা চা ও খাবার নিয়ে আয়। আর—বৈঠকখানা থেকে আজকের পেপারটা এনে দে।

দ্রুত প্রস্থান করলো গোকুল।

চা এবং খাবার আনার কথা শুনে রঞ্জন রায় প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সেন তাঁর মনোভাব বুঝে বলে উঠলেন,—ঠিক আছে। এক কাপ চা মুখে দিলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।

রায় চুপ করে গেলেন।

গোকুল প্রথমে কাগজখানা নিয়ে এলো। রায় তার হাত থেকে সেটা নিয়ে খবরটা বের করে সেনের চোখের সামনে ধরলেন। সেন পড়তে লাগলেন জোরে জোরে—

বৈচিত্র্যপূর্ণ নিদারুণ হত্যাকাণ্ড

দুইজন পুলিস নিহত

গতকল্য রাত্রি প্রায় দেড়টার সময় একখানি মোটর গাড়ী তীরের বেগে চলিয়াছে দেখিয়া একজন কনস্টেবলের মনে কেমন সন্দেহ হয়। ধর্মতলা ষ্ট্রীটের যে জায়গা হইতে ফ্রি-স্কুল ষ্ট্রীট্ আরম্ভ হইয়াছে, ঠিক সেই জায়গায় উক্ত কনস্টেবল ডিউটিতে ছিল। মোটরখানি আসিতেছিল পূর্বদিক হইতে। গাড়ী কাছে আসিলে কনস্টেবল চীৎকার করিয়া গাড়ী থামাইতে বলে। তখন গাড়ী হইতে একখানি তীক্ষ্ণধার ছোরা নিক্ষিপ্ত হইয়া কনস্টেবলকে বিদ্ধ করে। ফলে তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হয়

মোটরখানি তারপর আরো জোরে ছুটিতে থাকে এবং চৌরঙ্গীর মোর ঘুরিয়া বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটে আসে। তখন আর একজন কনস্টেবল মোটরখানা থামাইবার চেষ্টা করিলে সে-ও অনুরূপভাবে নিহত হয়।

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যে-ছোরা দুইটির সাহায্যে দুইজনকে হত্যা করা হইয়াছে, সেই ছোরা দুইটিতে একটি করিয়া রক্তবর্ণ কাগজ লাগানো ছিল। এবং উভয় কাগজেই বড়-বড় অক্ষরে লেখা ছিল—'অক্টোপাস'।

স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, 'অক্টোপাস'—এই ছদ্মনামে কোন ব্যক্তি বা দল কনস্টেবল দুই জনকে হত্যা করিয়াছে। এই হত্যার কারণ এখনও নির্ণীত হয় নাই। পুলিস-তদন্ত চলিয়াছে।

পড়া শেষ করে সেন মৃদু হাসলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন—অক্টোপাস সম্বন্ধে আপনার কোন ধারণা আছে?

রায় বললেন,—সত্যি বলতে, আমার মাথায় কিচ্ছু আসছে না।

চা ও খাবার এলো। সেন নিজের হাতে খাবারের ডিস এবং চায়ের পেয়ালা রায়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে হাসিমুখে বললেন,—শুরু করুন!

—আপনি?—রায় বললেন।

—এ-কাজ আমার অনেকক্ষণ আগে শেষ হয়ে গেছে। আপনি খেয়ে নিন্।

ক্রিং···ক্রিং···ক্রিং···

টেলিফোন বেজে উঠলো। রঞ্জন রায় বললেন,—দেখুন, আবার কি খবর।

সেন উঠে রিসিভারটা কানে তুলে ধরলেন। লালবাজার থেকে কমিশনার সাহেব ফোন করছেন।

মিনিট ছুয়েক ফোনে কথা বলে সেন আবার নিজের আসনে এসে বসলেন।

রঞ্জন রায় সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন,—ব্যাপার কি? শুভ সংবাদ? না, অশুভ?

—এমন কিছু নয়।—হেসে সেন বললেন।

—তার মানে?

—মানে, ফোনে যে খবর এলো, তা শুভ নয়, অশুভও নয়। তবে ভবিষ্যতে কি হবে, এখন বলা কঠিন।

—ব্যাপার কি?

—ব্যাপার হল এই: কমিশনার সাহেব বললেন, আমি যেন আজ বেলা এগারোটার মধ্যে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। কাজেই তাঁর সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত ব্যাপার শুভ কি অশুভ, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

একটু নীরব থেকে রায় বললেন,—অনুমানে কিছু বুঝছেন?

—বুঝতেই যদি পারবো, তা হলে আর ভাবনা কি? তবে অনুমানের কথা বলছেন, মনে হয়, খুব সম্ভব ঐ অক্টোপাসের কেস্!

সেন চুপ করলেন।

রায়ও নীরব।

হঠাৎ বললেন রায়,—তারপর প্রমথেশবাবুর কেসটার ব্যাপার কাগজে তো পড়লাম সব। রীতিমত সিরিয়স!

সেন একটু গম্ভীর মুখে বললেন,—আপনার অনুমান সত্যি!

—কিছু আবিষ্কার করতে পারলেন?

—না।

—কিছু না?—ঈষৎ অসহিষ্ণু কণ্ঠে রায় বললেন।

সেন বললেন,—না মিস্টার রায়, এখনো পর্যন্ত কিছু আবিষ্কার করতে পারিনি।

—ভাবনার কথা!

—তবে এইটুকু বুঝতে পেরেছি যে, প্রমথেশবাবুকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে; এবং একাজ করেছে ওঁরই কোন বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি।

—কেমন করে বুঝলেন?

—একটা লজেঞ্চে বিষ মাখিয়ে ওঁকে খেতে দেওয়া হয়েছিল। লজেঞ্চটা পেয়েছিলাম ওঁর মুখের মধ্যে থেকেই। কাজেই বুঝতে পারছেন, আত্মীয় বা কোন ঘনিষ্ঠ পরিচিত ব্যক্তি ছাড়া কে একাজ করবে?

সংক্ষেপে রঞ্জন রায় শুধু বললেন,—হুঁ!

সেন বললেন,—তবে একটা সুখবর হল এই যে, নিরীহ বেচারী কনস্টেবল দুজনকে যে খুন করেছে, তারই হাতে প্রমথেশবাবুর মৃত্যুও ঘটেছে। খুনী ঐ অক্টোপাস!

—বলেন কি?

—হ্যাঁ, ঐ অক্টোপাসই প্রমথেশবাবুকে খুন করেছে। কাজেই প্রমথেশবাবুর আসামীকে ধরতে পারলে কনস্টেবল-হত্যার তদন্তও শেষ হবে।

রায় প্রশ্ন করলেন,—অক্টোপাসই যে প্রমথেশবাবুকে খুন করেছে, কি করে তা বুঝলেন ?

সেন একটু হেসে একটা লাল রঙের খামের মধ্যে থেকে লাল রঙের কাগজে লেখা একটি চিঠি বার করে রায়ের হাতে দিলেন, দিয়ে বললেন,—পড়ে দেখুন, তা হলে বুঝবেন।

চিঠিখানা রায় পড়লেন। যে সব আসামীরা 'আসামী' হিসেবে নিজেকে জাহির করতে চায় লোকসমাজে—বিখ্যাত হতে চায় আসামীরূপে, এই অক্টোপাসও সেই ধরনের আসামী। চিঠিখানায় সে সাবধান করে দিয়েছে সেনকে—যেন তিনি প্রমথেশবাবুর কেসটায় হস্তক্ষেপ না করেন। নীচে নাম লেখা রয়েছে 'অক্টোপাস'! চিঠিখানার ভাষা এইরূপ : 'প্রমথেশ সান্যালের ব্যাপারে মাথা দিলে খুবই অন্যায় করবে সেন। যেটুকু করেছো তা ক্ষমা করতে পারি। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করে দিচ্ছি, আমার বিরুদ্ধে তুমি আর এসো না। এলে তোমার মঙ্গল হবে না। তোমার জীবন বিপন্ন করতে চাইনে।'

রায় বললেন,—কোন কোন আসামীর এই রকম বাতিক থাকে দেখেছি। চিঠি দিয়ে সাবধান করে দেওয়া।

সেন বললেন,—সাবধান করে দেওয়াই কিন্তু ওদের আসল উদ্দেশ্য নয়; ওরা চায় ঐ চিঠির মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করতে। কিন্তু আমরা তো জানি ইট রেন্‌স্ নট য়্যাজ ইট থান্‌ডার্‌স্—যত গর্জে

তত বর্ষে না। বরং এই ধরনের আসামীগুলো খুব তাড়াতাড়িই ধরা পড়ে যায়।

—সত্যিই তাই।

সেন বললেন,—এখন ব্যাপার হয়েছে কি জানেন? কাল রাতে—রাত তখন প্রায় দেড়টা—প্রমথেশবাবুর বাড়ী থেকে ফিরে মোটরটা গ্যারেজে তুলতে যাচ্ছি, এমন সময় একটা মোটর ফুলস্পীডে বেরিয়ে গেল আমাদের সামনে দিয়ে; যাবার সময় দিয়ে গেল ঐ চিঠিটা। আমরা পাছে অনুসরণ করি, এই ভয়েই মোটরটা ঐ রকম জোর ছুট দিয়েছিল। এবার বুঝতে পারছেন তো ব্যাপারটা? মোটরটাকে ঐরকম সন্দেহজনকভাবে ছুটতে দেখেই পুলিস দুজন বাধা দিতে গিয়েছিল—গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে।

—হুঁ!—বলে রঞ্জন রায় চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিলেন। তারপর পেয়ালাটি টেবিলে রেখে ধীরে ধীরে বললেন,—কিন্তু আসামীর সাহসের প্রশংসা না করে থাকা যায় না মিঃ সেন!

—একশোবার! শুধু সাহস নয়—কার্যদক্ষতাও যথেষ্ট আছে। এ পর্যন্ত আমার হাতে যত কেস পড়েছে, প্রায় সব কেসেই দেখেছি, আসামী কিছু-না কিছু সূত্র রেখে গেছে। কিন্তু অক্টোপাস কেবল রেখে গেছে, একটুকরো বিষমাখানো লজেঞ্জ—যা থেকে কাজে অগ্রসর হওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। প্রচুর সময় আর গবেষণার প্রয়োজন। তবেই যদি…সত্য বলতে কি, প্রমথেশবাবুকে খুন করাই যদি অক্টোপাসের শেষ-কাজ হয়ে থাকে অর্থাৎ তার আর কাজের নিদর্শন যদি আমাদের চোখে না পড়ে, তাহলে তাকে গ্রেফ্-

তার করা অসম্ভব হতে পারে! অথচ তাকে ধরতে না পারলে আপসোস আর লজ্জার সীমা থাকবে না।

রায় জিজ্ঞাসা করলেন,—এমন কথা মনে করছেন কেন?

সেন বললেন,—কাল রাত্রে প্রমথেশবাবুর ওখানে গিয়ে প্রমথেশবাবুর দুই বন্ধু আর তাঁর ছেলেকে আশা দিয়ে এসেছি যে, আসামীকে গ্রেফ্‌তার করবো। কিন্তু এখন ভাবছি, কথাটা বলেছি রাদার র‍্যাশ্‌লি—ভালো করে সব দিক বিবেচনা না করে।

রায় বললেন,—কিন্তু আমি জানি মিস্টার সেন, অক্টোপাসকে গ্রেফ্‌তার করতে আপনার খুব বেশী দিন সময় লাগবে না, এ বিশ্বাস আমার আছে।

সেন বললেন,—বাক্‌-আপ করছেন!

—না, না! আপনাকে বাক্‌-আপ করবো, এমন ধৃষ্টতা আমার হতে পারে না।

তারপর আরো দু-চারটি কথা কয়ে রায় বিদায় নিলেন।

সেন এলেন অন্দরে। কি কাজ ছিল জানি না, মিনিট দশেক পরেই একটা সিগারেট টান্‌তে টান্‌তে আবার বাইরের ঘরে প্রবেশ করলেন।

মন চিন্তান্বিত এবং বিমর্ষ। হঠাৎ টেবিলের উপর নজর পড়তে তাঁর চিন্তা এবং বিমর্ষতা নিমেষে যেন উবে গেল! তিনি দেখলেন টেবিলের ওপর পড়ে রয়েছে আর একখানি লাল রঙের খাম!··· আবার এলো অক্টোপাসের চিঠি?···

সেন খামখানি ছিঁড়ে ফেললেন। ছিঁড়তেই তার মধ্য থেকে

প্রাণ নিয়ে খেলা—

সঙ্গে সঙ্গে বিকট একটা আর্ত্তনাদ করে কনেষ্টবলের দেহ লুটিয়ে পড়লো।

বেরুলো একখানা লাল রঙের কাগজ। তাতে আগের মতই ক-ছত্র লেখা। রুদ্ধ নিশ্বাসে তিনি পড়লেন।

চিঠিতে লেখা—

পূর্বে তোমাকে সাবধান করে দিয়েছি সেন, তুমি গ্রাহ্য করোনি। ···তুমি কি ভাবো, আমার চেয়েও তোমার বুদ্ধি বেশী তীক্ষ্ণ? তা যদি ভেবে থাকো, তা হলে বলবো, তুমি ভুল করেছো! গোয়েন্দার কাজে তোমার যথেষ্ট নাম আছে, স্বীকার করি। কিন্তু আমার কাছে তুমি তৃণ-তুল্য!

আমার কথা শুনে হয়তো হাসবে! বেশ, কে বেশী চতুর, হাতে হাতে তার প্রমাণ তোমাকে দেব। আজ ৮ই মার্চ। আজ থেকে সাতদিন পরে—১৫ই মার্চ, রাত দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে প্রসিদ্ধ মোটর ব্যবসায়ী দেবব্রত রায় চৌধুরীকে আমি খুন করবো। আমার এ সংকল্প তুমি ব্যর্থ করতে পারবে? যদি পারো, বুঝবো, আমার চেয়ে তুমি বেশী চতুর—আমাকে গ্রেফ্‌তার করবার ক্ষমতা তোমার আছে!

আর একবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, ১৫ই মার্চ—রাত দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে! দশটার আগে নয়, এগারোটার পরেও নয়!···

ইতি

অক্টোপাস

সেন ভাবেন, লোকটা উন্মাদ নাকি? চিঠিখানা কি সেই উন্মাদেরই প্রলাপ? আসামীর এতদূর সাহস হবে, এ কি বিশ্বাস করবার মত?

অস্থির পদে পদচারণা করতে থাকেন সেন। যতই ভাবেন,

ততই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন! প্রলাপ না প্রতিজ্ঞা? সত্য না মিথ্যা?

তারপরই আবার ভাবেন, যে লোক এই প্রকাশ্য দিবালোকে, জনবহুল পরিবেশ অগ্রাহ্য করে এমন একখানা চিঠি বাঘের গুহায় ফেলে যেতে পারে, তাকে অবিশ্বাস করবার মতোই বা কি থাকতে পারে?

চার

রবির অভিমান

দুদিন পরের এক সুন্দর সকাল।

আগের দিন রাত্রে আধঘণ্টা ধরে প্রচুর বৃষ্টি হয়ে গেছে। বর্ষণ-ধৌত আকাশটা তাই এতো সুন্দর লাগছে। নীলাভ আকাশের বুকটা কাঁচের মতোই স্বচ্ছ মনে হয়।

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে সেন আকাশ দেখছেন। পেঁজা তুলোর মতো কয়েক টুকরো সাদা মেঘ উড়ে বেড়াচ্ছে এদিক-ওদিক। বেশ লাগে দেখতে।

রবির কিন্তু চুপচাপ বসে থাকা ধাতে সয় না। কিভাবে একটা কথার উত্থাপন করা যায় চিন্তা করতে থাকে। একটু পরে হেসে বললো,—অমন তন্ময় হয়ে কি দেখছো অনুপদা? আকাশের বুকে অক্টোপাসের কোন হদিস পেলে নাকি?

সেন ধমক দিয়ে ওঠেন,—আঃ! তুমি দেখছি আমাকে একটুও শান্তিতে থাকতে দেবে না রবি! তোমার জ্বালাতেই আমাকে পাগল

হতে হবে শেষ পর্যন্ত! কোথায় প্রকৃতির রূপ দেখে একটু শান্তি-লাভের চেষ্টায় আছি, অমনি অক্টোপাসের নাম করে শান্তিটুকুর বারোটা বাজিয়ে দিলে! সর্বদাই খুন-জখম নিয়ে কাঁহাতক চিন্তা করা যায়? দেখছি তুমিই আমার মাথাটা খারাপ করে দেবে!

—আই রিগ্রেট, অনুপদা?

—খুব হয়েছে, থাম? আর ন্যাকামি করতে হবে না। যতো সব পাগলের পাল্লায় পড়েছি!

সেন কেস থেকে সিগারেট বের করে আগুন ধরালেন। তাঁর মেজাজটা একটু নরম হয়ে এলে রবি প্রশ্ন করলো,—দেবব্রতবাবুকে নিরাপদে রাখবার জন্য কি উপায় ঠিক করলে?

—না, এখনো কিছু ঠিক করিনি। ভেবেছি, এ-বিষয়ে তোমার সঙ্গে পরামর্শ করবো সময়মত।

রবি বললো,—আমার কি মনে হচ্ছে জানো অনুপদা?

—বলো?

—আমার মনে হচ্ছে, বড় বড় মোটর-ব্যবসায়ীদের ওপর যে কোন কারণে হোক, অক্টোপাসের দারুণ আক্রোশ জন্মেছে! তাদের নির্মূল করতে চায় এই অক্টোপাস! প্রমথেশবাবু গেলেন; দেবব্রত-বাবুকেও সরাবে বলে পণ করেছে! এ-পণ যদি রক্ষা করতে পারে, তা হলে তারপর হয়তো একদিন শুনবো, তারাচরণবাবু নেক্সট্ ভিকটিম্! তারপর কোনদিন শুনবো, কার্ল গিয়েছেন,…জন গিয়েছেন!…এই ভাবে হয়তো চলতে থাকবে অক্টোপাসের তাণ্ডব!…

সেন একটু হেসে বললেন,—কিন্তু আমি যদি বলি, তাঁরই ঘরের

কোন লোক তাঁকে খুন করেছে? তাহলেও তো আশ্চর্য হবার কিছু নেই?

রবি বললো,— তা অবশ্য নেই। তাহলে কি তুমি বলতে চাও, দেবব্রতবাবুকে সে খুন করবার চেষ্টা করবে না?

—মোটেই সে-কথা বলছি না! কারণ, এটা যে ঘরোয়া ব্যাপার, তার কোন প্রমাণ এখনো পর্যন্ত আমরা পাই নি। কাজেই—তবে অক্টোপাসকে তার পণ রক্ষা করতে দেব না নিশ্চয়ই! এবং যদি সুযোগ পাই, তাহলে ঐ দিনই তাকে পাকড়াও করবো!

—তুমি কি বলতে চাও, স্বেচ্ছায় সে নিজেকে ধরা দিতে আসবে?

—তোমার এ-কথায় যুক্তি আছে, রবি। কিন্তু গ্রেফ্‌তার যদি নাও করতে পারি, পণ রক্ষা করতে তাকে কখনোই দেবো না!

—আমি ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি অনুপদা, কথার খেলাপ করবার মতলব যদি তার না থাকবে, তাহলে সে কেমন করে বললে, দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে খুন করবে! সময়টাকে এমন মেপে-কষে নেবার শক্তি সে পেলো কোথা থেকে?

হেসে সেন বললেন,—'পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে'—কথাটা জানো তো? এও হচ্ছে তাই! ক্ষমতা থাক বা না থাক, আমাদের কাছে তার একটু বাহাদুরি নেবার ইচ্ছে হয়েছে। এ ছাড়া আর কোন কারণ দেখছি না এর মধ্যে!

রবি নিরুত্তরে রইলো।

সেন টেলিফোনের কাছে এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলে রিং করলেন রঞ্জন রায়ের বাসায়।

রিসিভারে সাড়া পেয়ে বললেন,—আমি অনুপ সেন।…হ্যাঁ।

বিশেষ প্রয়োজনে আপনার সাহায্য চাই মিঃ রায়। আপনি যদি অনুগ্রহ করে বেশ বিশ্বাসী এবং গুপ্তচরের কাজে ওস্তাদ এমন একজন লোক পাঠান, তা হলে অত্যন্ত উপকৃত হবো!—ব্যাপারটা পরে আপনাকে সময়মত জানাবো। হ্যাঁ, অক্টোপাসের ব্যাপারের জন্যই এ লোক চাইছি।···ও···লোক আছে?···নাম হরিহর?···হ্যাঁ, আজই দরকার। সন্ধ্যা সাতটা-সাড়ে সাতটা নাগাদ পাঠাবেন, আমি বাড়িতেই থাকবো।—বেশ, তাই হবে, সাতটা থেকে আটটা পর্যন্তই আমি অপেক্ষা করবো। ধন্যবাদ।

রিসিভার নামিয়ে সেন একটা সোফায় বসলেন। তাঁর মুখ ক্রমশঃ চিন্তার ভারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো।···

ব্যাপারটা পরিষ্কার ভাবে জেনে নিতে রবির খুবই আগ্রহ হলো। কিন্তু সেন যখন চিন্তা করেন, তাঁর সে চিন্তায় ব্যাঘাত দিতে রবির সাহস হয় না! সে বেশ জানে, তার অনুপদা যা চিন্তা করেন, তা অর্থহীন নয়—প্রত্যেকটি চিন্তা বা চিন্তার প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর মূল্যবান্। কাজেই এ সময় তাঁর চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটালে লোকসান হবে—লাভ হবে না! এবং একচোট বকুনিও খেতে হবে সেই সঙ্গে। তাই সে চুপ করে রইলো।

মিনিট পাঁচেক কাটলো।

সেন এবার তাঁর সমস্ত চিন্তা বিসর্জন দিয়ে রবির পানে তাকিয়ে বললেন,—কি হে, তুমি এমন চুপচাপ বসে রয়েছো, কথা বলছো না যে?

রবি বললো,—কার সঙ্গে কথা বলবো? পাথরের মূর্তির সঙ্গে?

সেন হাসলেন,—তা বটে!

— আচ্ছা অরূপদা—

—বলো ?

—তুমি মিস্টার রায়ের কাছে বিশ্বাসী এবং গুপ্তচরের কাজ-জানা লোক চাইলে, সে-কাজ কি আমাকে দিয়ে হতো না ? আমি কি এতই অপদার্থ ?

সেন বুঝলেন, রবির অভিমান হয়েছে। তাই তিনি স্নেহের সুরে বললেন,—না, তা নয়। তোমাকে দিয়ে হবে না, এমন কাজ নেই রবি। কিন্তু কাজ অনেক—তোমাকে অন্য কাজে লাগাবো স্থির করেছি। উপস্থিত যে-কাজ পড়েছে, এ কাজে তোমাকে লাগাচ্ছিনে কেন, জানো ? এ-কাজে দিন-রাত বাইরে থাকতে হবে। কিন্তু তোমাকে আমার সর্বক্ষণ দরকার ! তুমি তো জানো, প্রত্যেকটি কাজই তোমার সঙ্গে যুক্তি-পরামর্শ করে তবে করি। কাজেই তুমি বাইরে থাকলে আমাকে বহু অসুবিধা ভোগ করতে হবে।

একটু চুপ করে থেকে রবি বললো,—কিন্তু তদন্ত যে চালাবে বলছো, হদিস কিছু পেলে ?

—হদিস পেলে তোমাকে নিশ্চয়ই বলতাম। পাইনি।

—তবে ?

—বলতে গেলে নেহাত খামখেয়ালীভাবেই কাজটাতে অগ্রসর হচ্ছি। কথায় বলে, ছাই থেকেও সোনা মেলে ! হয়তো শেষ পর্যন্ত কিছু হদিস মিললেও মিলতে পারে।...যাই হোক, পরে তোমার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করবো।

পাঁচ

জীবন নিয়ে খেলা

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা।…

সেন বসে আছেন বৈঠকখানায়।—সোফায় বসে একখানি ইংরাজী বই পড়ছেন। বই পড়লেও, বই পড়া তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। আসল ব্যাপার, তিনি হরিহরের প্রতীক্ষায় বসে আছেন।

দেওয়ালে টাঙানো বড় ঘড়িটায় সাতটা বেজে চল্লিশ মিনিট হয়েছে, এমন সময় এক অপরিচিত লোক এসে প্রবেশ করলো সেনের ঘরে। আগন্তুকের কাঁধে এক বিরাট বোঁচকা। বোঁচকাটা মেঝেয় নামিয়ে ধীরে ধীরে সে সেনের সামনে এলো, এবং দুহাত তুলে তাঁকে নমস্কার করলো।

সেন প্রতি-নমস্কার জানিয়ে প্রশ্ন করলেন,—কে তুমি? কোথা থেকে আসছো?

লোকটা বললো,—আজ্ঞে, আমি মিস্টার রায়ের কাছ থেকে আসছি। তিনি আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।

—ও, বসো বসো।

লোকটি বসলো।

সেন প্রশ্ন করলেন,—তোমার নাম হরিহর?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

—কিন্তু ওটা কি? কি আছে ঐ বোঁচকায়?

—ভেট!

—ভেট? সে আবার কি?—অতি-মাত্রায় বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন সেন।

মৃদু হেসে আগন্তুক বললো,—আজ্ঞে হ্যাঁ, এটা আপনার জন্যই এনেছি।

সেনের বিস্ময় বাড়লো। তিনি বললেন,—আমার জন্যে এনেছো? কি আছে ওর মধ্যে?

—আজ্ঞে, আমি তা বলতে পারবো না। খুললেই দেখতে পাবেন কি আছে!

—ভারী মজার মানুষ তো হে তুমি! আচ্ছা খোলো, কি সম্পদ এনেছো দেখি!

—আপনি নিজে সময়মতো খুলে দেখবেন।

অত্যন্ত বিস্ময়ে সেন এগিয়ে গেলেন বোঁচকার দিকে। বোঁচকার মুখটা খুব শক্ত করে বাঁধা। কাজেই মুখটা খুলতে বেশ কিছু বিলম্ব হলো। এবং খোলা শেষ হতেই তাঁর দু'-চোখ বিস্ময়ে আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে উঠলো! তিনি দেখলেন, তার মধ্যে রয়েছে এক অপরিচিত ভদ্রলোকের মৃতদেহ!...

সেনের মুখ থেকে আপনা থেকেই বেরিয়ে এলো—একি হরিহর?

কোথায় হরিহর?—ঘরে কেউ নেই।.. শূন্য ঘর।

সেন ক্ষিপ্তের মত চীৎকার করে উঠলেন,—হরিহর...হরিহর!

উত্তর নেই। শুধু ব্যর্থ প্রতিধ্বনি সেনের কানে ফিরে এলো।...

তিনি ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলেন। বাইরে এসে তাকালেন এদিক-ওদিক। কাকেও দেখতে পেলেন না। হঠাৎ রাস্তার দিক থেকে কানে এলো মোটরের গর্জন। শব্দ লক্ষ্য করে তাকিয়ে দেখেন

তাঁরই দরজা থেকে একখানা কালো রঙের মোটর তীরের বেগে বেরিয়ে গেল।···

অসহায় দৃষ্টিতে কয়েক সেকেণ্ড সেইদিকে তাকিয়ে থাকার পর সেন ধীরে ধীরে হতাশমনে ফিরে এলেন বাইরের ঘরে!

ঠিক এই সময় রবি এলো। এসে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলো,—কি অনুপদা, অত চ্যাঁচাচ্ছিলে কেন?

ম্লান হেসে সেন বললেন,—ঐ যে; চেয়ে দেখ!

মৃতদেহটা তাকে দেখিয়ে সেন তাড়াতাড়ি ফোনের কাছে এগিয়ে গেলেন, এবং রঞ্জন রায়কে যথাসম্ভব শীঘ্র এখানে আসবার জন্য অনুরোধ জানালেন।

রবির বিস্ময়ের সীমা নেই! সে প্রশ্ন করলো,—ব্যাপার কি অনুপদা? কিছু তো বুঝতে পারছি না।

শান্ত কণ্ঠে সেন বললেন,—মিস্টার রায় আসুন, তারপর সব বুঝতে পারবে।

আর কোনো কথা না বলে রবি মৃতদেহটার দিকে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে রইলো···

লালবাজারের নামকরা সুদক্ষ ডিটেক্‌টিভ্‌ ইনস্পেক্‌টর রঞ্জন রায় এসে আবির্ভূত হলেন অল্প সময়ের মধ্যেই। সেনের কাছ থেকে ইতিপূর্বে এমন জরুরী তলব তিনি কোনদিন পেয়েছেন বলে মনে পড়ে না। তিনি আসতেই মৃতদেহটা তাঁকে দেখিয়ে সেন বললেন,—চিনতে পারছেন,—কে?

—এ যে হরিহর!—আতঙ্কজড়িত কণ্ঠে মিস্টার রায় বলে উঠলেন।

সেন বললেন,—আমারো তাই সন্দেহ হয়েছিল।

– কিন্তু এর এ অবস্থা করলে কে ?

—বুঝতে পারছেন না ?

—না তো !

নিশ্বাস ফেলে সেন বললেন,—অক্টোপাস !

—অক্টোপাস ?

—হ্যাঁ।···জীবনে এমন অপমান আমাকে আর কেউ কোনদিন করতে পারেনি মিস্টার রায়, করলো এই অক্টোপাস।···অক্টোপাসেরই এক অনুচর আপনার এই হরিহরকে পথে খুন করে তার দেহ এনে আমাকে ভেট দিয়ে গেল।

রঞ্জন রায় নির্বাক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন সেনের মুখের দিকে।

সেন বলতে লাগলেন,—জানেন মিস্টার রায়, হরিহর সেজে এসে লোকটা আমাকে বললো, আপনার জন্য ভেট এনেছি।···ওঃ, আমার মুখে যেন চুন-কালি মাখিয়ে দিয়ে গেল! আমার এতটুকু সন্দেহ পর্যন্ত হলো না! একটু হুঁশিয়ার হতাম যদি!

রবি বললো পাশ থেকে,—কিন্তু মিস্টার রায় লোক পাঠাবেন, সে খবর ওরা জানলো কি করে ?

সেন বললেন,—আমরা যখন ফোনে কথা বলি, তখন নিশ্চয় তারা লাইন্ ইন্টারসেপ্ট করে সে-কথা শুনেছে। কিন্তু আমি তা ভাবছি না! আমি ভাবছি, মানুষের প্রাণ ওদের কাছে এতই তুচ্ছ!··· প্রাণ নিয়ে খেলা করতে ওদের এতই ভাল লাগে!

রায় বললেন,—খুনেই ওদের আনন্দ, মিস্টার সেন।—এ কাজকে ওরা বাহাদুরি বলে মনে করে! আমরা যেমন রহস্যময় কেসের

সমাধান ঘটিয়ে বাহাদুরি পেতে চাই, লেখক যেমন ভালো বই লিখে বাহাদুরি চান, এরা তেমনি গোয়েন্দা এবং সমাজের চোখে ধুলো দিয়ে ক্রমাগত নির্দ্দয়ভাবে খুন-খারাপি চালিয়ে যাওয়াটাই বাহাদুরি বলে মনে করে !

রবি বললো,—কিন্তু এ বাহাদুরি দেখানোর অর্থ তো নিজেদের মৃত্যুর পথ পরিষ্কার করা !

হেসে রায় বললেন,—সে কথা আপনি বলছেন ! কিন্তু যারা বাহাদুরি দেখাচ্ছে, তাদের মনে কি ও-কথা জাগে ? তারা কি ভাবে, এতে নিজেদেরই চরম বিপদ ডেকে আনা হচ্ছে ? তা যদি ভাববে, তাহলে এ কাজ করবে কেন ? ওরা ভাবতে পারে না যে, বাহাদুরি দেখানোর অর্থ গোয়েন্দাদের তদন্তের কাজে সুবিধা করে দেওয়া ! ফল মৃত্যু !··· তবে একথা স্বীকার করতেই হবে, অক্টোপাসের বাহাদুরির মধ্যে যথেষ্ট নূতনত্ব এবং দুঃসাহসের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে ! যেভাবে সে হরিহরকে মেরে তার দেহ উপহার দিয়ে গেল, এ কীর্তি ক্রাইম-ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সেন বললেন,—সত্যি মিস্টার রায়, অক্টোপাসের এ কীর্তি, আর আমার এই পরাজয়ের গ্লানি কোনদিন মুছবার নয় !

—এ পরাজয় শুধু আপনার একার নয় মিস্টার সেন, এ পরাজয় সমস্ত পুলিস-ফোর্সের। তবে একথাও ঠিক যে অক্টোপাস যদি তার চিঠির কথা রাখে অর্থাৎ ১৫ তারিখে সত্যই যদি দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে হানা দেয়, তা হলে বুঝতে হবে, তার আয়ু শেষ হয়ে এসেছে !

করে—দেখা যাক, কতদূর কি হয় !

এই বলে লাশের ব্যবস্থা করবার জন্য আসন ত্যাগ করে সেন টেলিফোনের কাছে যাবেন, এমন সময় তাঁর নজর পড়লো বাইরের দিকে। জানলার ফাঁক দিয়ে তাঁর দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে গাড়ীবারান্দার নীচে। একটা মানুষের ছায়া না? ছায়াটা নড়ছে।

সেন অন্তর্পণে উঁকি দিয়ে দেখলেন, হ্যাঁ, একজন জলজ্যান্ত লোকই বটে! লোকটা সন্দেহজনকভাবে এদিক-ওদিক্ দৃষ্টিপাত করছে।

সেন বিদ্যুদ্বেগে আচম্বিতে লোকটার সামনে গিয়ে বললেন,—কে আপনি?

তারপরই চিনতে পেরে বললেন,—ওঃ! সুব্রতবাবু! আসুন-আসুন। তা—হঠাৎ কি মনে করে?

সুব্রত প্রথমটা একেবারে হক্‌চকিয়ে গিয়েছিল। পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বললো,—এই এমনি একবার বেড়াতে এলাম আপনার কাছে। আপনার বাড়ি তো চিনতাম না—শুভেন্দুর কাছে থেকে ঠিকানা নিয়ে আসছি।

সেন হেসে বললেন,—বেশ করেছেন। আপনি এসেছেন, সেজন্য খুবই আনন্দ পেলাম। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে কেন? ঐ তো ড্রইংরুম—

সুব্রত বললো,—কোনটা আপনার ড্রইংরুম, তা কি আমি জানি মশাই? জানবো যদি, তাহলে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বোকার মতো এদিক-ওদিক চাইবো কেন? আপনার নাম ধরে চীৎকার করতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় আপনি এসে পড়লেন। ভগবান মঙ্গলময়! খুব সময়ে আপনি উদয় হয়েছেন! নচেত হয়তো আমাকে

চীৎকার শুনে আপনার দারোয়ান গোঁফে তেল দিয়ে বংশ হাতে "কৌন্ হ্যায়" বলে ছুটে আসতো!

সেন হাসি মুখে বললেন,—না সুব্রতবাবু, আমার দারোয়ানেরা এখনো এতখানি কর্তব্যপরায়ণ হয়ে উঠতে পারেনি!

সেনের অদ্ভুত ব্যবহার লক্ষ্য করে রবি এবং রঞ্জন রায় ওঁরাও দুজনে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন। সেন রায়কে উদ্দেশ করে বললেন,—আমি এঁকে নিয়ে একটু ওপরে যাচ্ছি মিস্টার রায়······আপনি ততক্ষণ ওটার যা ব্যবস্থা করবার হয় করুন। রবি আপনার কাছেই রইলো, যদি কিছু বলবার দরকার হয় ওকেই বলবেন।

বৈঠকখানার দিকে না গিয়ে সদর দরজা দিয়ে ঘুরে সেন সুব্রতকে সঙ্গে করে ওপরের লাইব্রেরী রুমে এসে হাজির হলেন। একথা সেকথার পর এক সময় সেন প্রশ্ন করলেন,—আচ্ছা, প্রমথেশবাবুর সম্পত্তি তো আপনারা তিন ভায়ে সমান ভাগেই পাবেন?

সুব্রতর চোখ দুটো সহসা অশ্রুতে ভরে ওঠে। বললো,—এ সম্বন্ধে এখন আপনাকে কিছুই বলতে পারবো না অনুপবাবু। বাবা আমাকে তাঁর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতেই চেয়েছিলেন। কাজেই এক্ষেত্রে আমি যদি তাঁর সম্পত্তি গ্রহণ করি, তাহলে হয়তো তাঁর মৃত আত্মা অসুখী হবে। আমি চাই না, তাঁর আত্মা অসুখী হোক।

—তাহলে আপনি কি কর্তব্য স্থির করেছেন? সম্পত্তি গ্রহণ করবেন না?

—আমি কিছুই স্থির করিনি মিস্টার সেন···নিজে আমি কিছু স্থির করবোও না। এ সম্বন্ধে মা, শুভেন্দু, এবং পিসিমা যা বলবেন, আমি

তাই মেনে নেবো। আমার নিজস্ব কোন মতামত প্রকাশ করবো না। ওঁরা যদি বলেন সম্পত্তি গ্রহণ করতে, গ্রহণ করবো। যদি কেউ বিন্দুমাত্রও আপত্তি করেন, হাসিমুখে ছেড়ে দেবো আমার অংশ।

সেন বললেন,—আপনার কিন্তু সম্পত্তি গ্রহণ করবার অধিকার আছে। যেহেতু আপনার বাবা কোন উইল করে যাননি!

—উইল!—একটু ম্লান হাসলো সুব্রত। তারপর বললো,—উইল আমি গ্রাহ্য করি না অনুপবাবু; বাবার ইচ্ছাটাকেই বড় বলে মনে করি। বাবা আমাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবেন, এই ইচ্ছাই প্রকাশ করেছিলেন। কাজেই···দেখি, মা আর পিসিমা কি বলেন; তাঁরা যা বলবেন, তাই মেনে নেবো।

সেন চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর আবার প্রশ্ন করলেন,—আচ্ছা, আপনাদের বাড়িতে যে নতুন চাকরটা এসেছে, নাম শুনেছি রতনলাল, ওর সম্বন্ধে কিছু জানেন?

সুব্রত বললো,—সামান্য একটু খবর জানি।

—কি রকম?

বলতে থাকে সুব্রত,—কিছুদিন আগের কথা। একদিন সকালে আমি আমার টালিগঞ্জের বাসায় বসে আছি, এমন সময় ঐ লোকটা হাজির হয় আমার কাছে। কিছুক্ষণ নিজের দারিদ্র্যের কাহিনী বলে শেষে শুধালো যে, আমি তাকে চাকর হিসাবে রাখতে পারি কিনা? নচেৎ তাকে না খেয়েই মরতে হবে। আমার একেবারেই চাকরের প্রয়োজন ছিল না—কাজেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে জবাব দিতে বাধ্য হলাম। শুনে সে হতাশ হয়ে পড়লো। তারপর সে অনেক অনুরোধ করে বললো, আমার কাছে না হোক, অন্য কোথাও যেন তার একটা

কাজের যোগাড় করে দিই। মনে পড়ে গেল বাবার কথা। গরীবের প্রতি বাবার যথেষ্ট মমতা। তাছাড়া একটা চাকরের জায়গায় দশটা চাকর রাখবার মত ক্ষমতাও তাঁর আছে। বাবার ঠিকানাটা দিয়ে লোকটাকে যেতে বললাম তাঁর কাছে। ব্যর্থ হতে হয়নি, বাবার অনুগ্রহে লোকটা কাজও পেয়ে গেল। এইটুকুই ওর সম্বন্ধে আমি জানি। কাজ পেয়ে ও একদিন এসেছিল আমাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে।

চুপ করলো সুব্রত।

ছয়

অক্টোপাসের কৃপা

লালবাজারে সেনের কিছু প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন শেষ করে তিনি নিজের মোটরে চড়ে সোজা এসে হাজির হলেন দেবব্রতবাবুর বাড়ির দরজায়। তখন সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ছটা। গাড়ী থেকে নেমে ভিতরে প্রবেশ করতেই দেবব্রতবাবুর এক ভৃত্যের সঙ্গে দেখা। তাকে তিনি প্রশ্ন করলেন,—বাবু আছেন?

— আজ্ঞে হ্যাঁ, আছেন। তাঁকে আপনার দরকার?

—হ্যাঁ। তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

—আসুন।

সেনকে সঙ্গে নিয়ে ভৃত্য বৈঠকখানায় এলো এবং সেখানে তাঁকে বসতে বলে বাবুকে খবর দেবার জন্য সে অন্দর-মহলের দিকে গেল।

মিনিট কতক পরে দেবব্রতবাবু এলেন। তিনি সেনকে দেখে যেমন আনন্দিত, তেমনি বিস্মিত হলেন! ব্যস্তভাবে হাসিমুখে তিনি বলে উঠলেন,—মিস্টার সেন! আপনি আমার বাড়ীতে পায়ের ধূলো দিবেন, এ আমার স্বপ্নের অগোচর!

সেন অপ্রতিভ কণ্ঠে বললেন,—এসব কথা বলে আমাকে মিথ্যা লজ্জা দিচ্ছেন! আমি এমন কেউ নই, যার জন্য এতবড় কথা বলছেন। আমি সাধারণ একজন গোয়েন্দা মাত্র! লক্ষপতিও নই—কোটিপতিও নই! কাজেই ও-সব কথা আমাকে কেন?

—কোটিপতি না হতে পারেন, কিন্তু আপনি গুণী!

—সত্যিই গুণী কি না, জানি না। তবে আপনি যখন বলছেন, মেনে নিলাম আমি গুণী। কিন্তু এ যুগে গুণীর আদর কোথায় বলুন? —আদর শুধু টাকার! টাকার ঠং-ঠং আওয়াজকেই আজ সারা জগৎ সেলাম দিচ্ছে।...যাক এসব তত্ত্ব কথা, এখন যে জন্য এসেছি, বলি।

সেনের সামনে চেয়ারে দেবব্রতবাবু বসলেন, বললেন,—বলুন?

সেন শুরু করলেন,—বিশেষ প্রয়োজনেই আপনার কাছে আসতে বাধ্য হয়েছি। আমার কথা আপনার পক্ষে দুঃসংবাদ, তবু আমার একান্ত অনুরোধ, আপনি ভয় পাবেন না!

দেবব্রতবাবুর মুখ পাংশু হলো। একটি কথাও তাঁর মুখ দিয়ে বেরুলো না। পলকহীন নেত্রে তিনি তাকিয়ে রইলেন সেনের পানে।...নিষ্প্রাণ তাঁর দৃষ্টি!

সেন দমে গেলেন তাঁর মূর্তি দেখে! কথাটা বলতে আর সাহস পাচ্ছেন না! কিন্তু উপায় কি?—দমলে চলবে না! কাজেই তিনি

চেয়ারে বসে আছেন শুধু দেবব্রতবাবু। নিশ্চল—নিস্পন্দ।

নিজেকে একটু শক্ত করে নিয়ে অক্টোপাসের পণের কথা দেবব্রত-বাবুকে আগাগোড়া খুলে বললেন।

সব কথা শুনে দেবব্রতবাবু অত্যন্ত ভীত হলেন। মনে হলো, হৃৎপিণ্ডের দোলা যেন বন্ধ হয়ে আসছে তাঁর···যেন আর নিশ্বাস নিতে পারছেন না।

কথাটা বলে সেন একটু নীরব রইলেন। তারপর বললেন,—এত মুষড়ে পড়লে চলবে না দেবব্রতবাবু। বিপদে ধৈর্য হারানো উচিত নয়, আপনার মত বিচক্ষণ লোককে এটুকু বোঝাবার চেষ্টা ধৃষ্টতা মাত্র! কিন্তু আপনি কি ভাবেন, আমাদের পুলিস-পাহারাকে উপেক্ষা করে অক্টোপাস আপনার কোন অনিষ্ট করতে পারবে? আপনাকে এমনভাবে পাহারা দেওয়া হবে যে, একটা পিঁপড়ে পর্যন্ত আপনার কাছে ঘেঁষতে পারবে না!

দেবব্রতবাবু একটুও আশ্বস্ত হলেন না এ কথায়। বড় একটা নিশ্বাস পড়লো তাঁর নাক দিয়ে···এ নিশ্বাস তিনি রোধ করতে পারলেন না।

সেন বললেন,—আপনাকে সেদিন কিভাবে থাকতে হবে, কি করতে হবে, সে-সব কথা আজ আর বলবো না, বলবো তার আগের দিন অর্থাৎ ১৪ তারিখে। এখন আমার অনুরোধ, এ নিয়ে আপনি অকারণ আতঙ্কগ্রস্ত হবেন না। আমার কথা বিশ্বাস করুন, অক্টোপাস আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না!

দেবব্রতবাবু এবারও কোন কথা বললেন না। বলবেন কি করে? আতঙ্কে তিনি অভিভূত! সেনের কথায় বিন্দুমাত্র সান্ত্বনা বা ভরসা পাচ্ছেন না।

—আচ্ছা, আজ উঠি। আবার ১৪ তারিখে বিকেলে এসে আপনার সঙ্গে দেখা করবো।···নমস্কার।

সেন উঠে দাঁড়ালেন।

হাত দুটো কোন রকমে কপালে তুলে দেবব্রতবাবু প্রতি-নমস্কার জানালেন।

এমন সময় সে কক্ষে তারাচরণবাবু ও শুভেন্দুর প্রবেশ।

তাঁদের দেখে সেন বললেন,—এই যে তারাচরণবাবু! নমস্কার। ···শুভেন্দু, কি মনে করে?

শুভেন্দু বললো,—উদ্দেশ্য কিছু নেই, বাড়ীতে বসে থাকতে মোটে ভালো লাগে না! তাই ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

ওঁদের আসতে দেখেও দেবব্রতবাবু কোন কথা বললেন না, ওঁদের দিকে ফিরেও তাকালেন না—যেমন মাথা হেঁট করে বসেছিলেন, তেমনি বসে রইলেন।

তারাচরণবাবু কেমন অস্বস্তি বোধ করলেন দেবব্রতবাবুর অবস্থা দেখে। তিনি প্রশ্ন করলেন,—আপনার কি হলো দেবব্রতবাবু?

তারাচরণবাবুর দিকে তাকিয়ে দেবব্রতবাবু বললেন,—মিস্টার সেনকে জিজ্ঞাসা করুন, সব জানতে পারবেন।

আরো বেশী বিস্ময়ে তারাচরণবাবু সেনের দিকে তাকালেন।

হেসে সেন বললেন,—অহেতুক উনি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন।

—কেন, কি হলো হঠাৎ?

—হবার মধ্যে হয়েছে, প্রমথেশবাবুকে যে লোক খুন করেছে, সে আমাকে একটা চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, সামনের ১৫ই মার্চ তারিখে সে দেবব্রতবাবুকে খুন করবে।

—সর্বনাশ! বলেন কি! তাহলে উপায়?

—উপায় আমি ঠিক করেছি। লালবাজার থেকে একদল সশস্ত্র পুলিস-পাহারা এবং তিন-চার জন অফিসার এনে এঁকে পাহারা দেবার ব্যবস্থা করবো। বাড়ীর চারদিকে পুলিস থাকবে মোতায়েন। শুধু বাইরে নয়, বাড়ীর ভিতরেও আনাচে-কানাচে সর্বত্র পুলিস রাখা হবে। আর সমস্ত বাড়ীটা—বাইরে এবং ভিতরে ইলেক্‌ট্রিক আলোয় দিনের চেয়েও আলো করে রাখবার ব্যবস্থা করা হবে। কোনখানে এতটুকু অন্ধকার থাকবে না! আর যে ঘরে এঁকে রাখা হবে, সে ঘরে থাকবেন পাকা কজন অফিসার।

—আর আপনি?

—আমি ঐ শয়তানকে গ্রেফ্‌তার করবার জন্য ওয়াচ্‌ করবো।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে তারাচরণবাবু বললেন,—যাক, তাহলে দুর্ভাবনার কিছু নেই।

—কিন্তু দেবব্রতবাবু ভয় যাচ্ছে না কিছুতে!

—হাজার হোক মৃত্যু-ভয় তো।

—সে কথা ঠিক।

সেন নীরব হলেন।

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর তারাচরণবাবু বললেন,—আচ্ছা মিস্টার সেন, দেবব্রতবাবুকে খুন করার কি উদ্দেশ্য ওদের?

—উদ্দেশ্য কি, তা বুঝতে পারিনি। তবে প্রমথেশবাবুকে যে-উদ্দেশ্য নিয়ে খুন করেছে, এঁর বেলাতেও সেই উদ্দেশ্য মনে হয়। রবির অনুমান, লোকটা হয়তো মোটর-ব্যবসায়ীদের নির্মূল করতে চায়।

—অ্যাঁ! তাদের অপরাধ?

রীতিমত আঁত্‌কে উঠলেন তারাচরণবাবু।

—ভয় পাবেন না তারাচরণবাবু! খুব সম্ভব ১৫ই মার্চ তারিখেই তাকে গ্রেফ্‌তার করতে পারবো! তারপর সব খবর জানা যাবে। অবশ্য আসামী যদি হানা দেয়!

একটু থেমে দেবব্রতবাবুর দিকে ফিরে তিনি আবার বললেন,—আচ্ছা দেবব্রতবাবু, এ ব্যাপারে কাকেও আপনার সন্দেহ হয়? কারো সঙ্গে আপনার শত্রুতা? কোনদিন কারো সঙ্গে আপনার রেষারেষি বা ঐ ধরনের কিছু হয়েছে কিনা, বেশ করে ভেবে দেখুন তো?

কোন কিছু মনে পড়লো না দেবব্রতবাবুর। বললেন,—না মিস্টার সেন, অতীতের যতদিন পর্যন্ত আমার স্মরণে আসছে, তার মধ্যে কোন লোকের সঙ্গে আমার কোনদিন শত্রুতা হয়েছে বলে মনে পড়ে না।

তারাচরণবাবু বললেন,—কিন্তু এ যে ভয়ানক কথা, মিস্টার সেন! আমার পরোয়ানাও তাহলে হয়তো একদিন এমনিভাবে বেরুবে!

সেন এবার বিরক্ত হলেন। বললেন,—আপনারা কেন এত ভয় পাচ্ছেন, আমি বুঝছি না তারাচরণবাবু! আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো আপনাদের রক্ষা করার জন্য।

—আপনার কথা মেনে থাকা ছাড়া উপায় কি!

—ধন্যবাদ!...আমাদের কাজ আপনাদের রক্ষা করা, আর যারা অপরাধী, তাদের গ্রেফ্‌তার করা!...আচ্ছা, আজ তা হলে উঠি।

—এত তাড়াতাড়ি কিসের! আর একটু বসুন না।

—বসবার সময় নেই তারাচরণবাবু, এখন আরও এক জায়গায়

যেতে হবে আমাকে। পরে একদিন সময়মত কথাবার্তা বলবো। কিছু মনে করবেন না!

—না, না, মনে আর কি করবো? মানে, আপনি রয়েছেন বলে মনে যেন অনেকটা বল পাচ্ছি। চলে গেলে আবার ভেঙে পড়বো।

—কেন ভেঙে পড়বেন? পুরুষ-মানুষ—ভয়ে এমন মুষড়ে পড়া ঠিক নয় তো! জগতের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে, ভয় শোভা পায় না! আপনি নিজেই ভেবে দেখুন।

—সে কথা সত্য। কিন্তু মন কি মানে?

—কেন মানবে না? জোর করে মনকে বশ করুন। মন তো পরের নয়, আপনার নিজের।···আচ্ছা, তা হলে আসি—নমস্কার।··· নমস্কার দেবব্রতবাবু।···শুভেন্দু, চলি হে, আবার দেখা হবে। বাবার কথা ভেবে অমন মুষড়ে থেকো না। দুঃখ করে কোন ফল হবে না! বিধাতার হাত!—যা হবার তা হয়ে গেছে! এর কি কোন প্রতিকার আছে, বলো? ইউ আর্ ইয়ং···মাস্ট বাক্ আপ্।

সেন বেরিয়ে গেলেন। দেবব্রতবাবুর অসহায় নিষ্পলক দৃষ্টি নিবদ্ধ রইলো তাঁর দিকে।

বাড়ী পৌঁছে সেন হাত-পা ধুয়ে পোশাক-পরিচ্ছদ বদলে যখন এককাপ চা নিয়ে বৈঠকখানায় এসে বসলেন, তখন বড় ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত্রি নটা বাজলো।

চিন্তার তরঙ্গে মন রীতিমত দোলা খাচ্ছে। পর-পর ক'সিপ্ মুখে দিয়ে চায়ের কাপ টেবিলের উপর রাখলেন, এবং সোফায় গা এলিয়ে দু চোখ বুজে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হলেন।

রবির প্রবেশ। তার হাতেও এক পেয়ালা চা। সেনের দিকে চেয়ে সে কোন কথা বললো না; নীরবে তাঁর পাশের আসনে বসে পড়লো। তারপর সেন ধীরে ধীরে চোখ খুলে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতেই রবি তাঁকে প্রশ্ন করলো,—নতুন কিছু ঘটলো নাকি?

সেন সোজা হয়ে বসে ঈষৎ হেসে জবাব দিলেন,—না, নতুন কিছু ঘটেনি, কিন্তু পুরানোর ঠেলাতেই চক্ষু চড়ক-গাছ!

—তা যা বলেছো!—রবি বললো,—১৫ তারিখেই তো এক বিরাট ব্যাপার!

একটু নীরব থেকে সেন বললেন,—কিন্তু অক্টোপাস যে প্রকৃতির লোক, তাতে আমাদেরও খুব বেশী সাবধানে থাকা দরকার, রবি! কখন যে কি করে বসে, বলা তো যায় না!

—সে কথা মিথ্যা নয়। এ ক'দিনের মধ্যে সে যদি কোন রকমে আমাদের কাবু করতে পারে, তা হলে নির্বিঘ্নে সে তার কাজ শেষ করে যাবে।

এরপর আরও নানা কথা শুরু হলো। কথা বলতে বলতে কোথা দিয়ে যে দুটি ঘণ্টা কেটে গেল, ওঁদের দুজনের কারুরই হুঁস নেই। হুঁস হলো ঘড়ির ঢং ঢং আওয়াজে। এগারোটা বাজছে। আর বেশি রাত না করে সেন রবিকে সঙ্গে নিয়ে আহার-পর্ব শেষ করলেন, তারপর যে যাঁর শয়নকক্ষে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

চিৎপুরে রবিদের নিজস্ব বাড়ী আছে। সেখানে তার মা-বাপ, ভাই-বোন সকলেই আছেন। দিনের বেলায় রবি বাড়ীতেই বেশির ভাগ সময় থাকে; কিন্তু রাতের বেলায় অনুপদাকে ছেড়ে সে একটি মুহূর্তও কোথাও থাকে না। রাতের আহারও অনুপদার গৃহেই তার বাঁধা।

পরদিন খুব প্রত্যুষে উঠেই সেন এবং রবি প্রাতঃভ্রমণে বেরুবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। এটি ওঁদের নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। যত কাজই থাক, অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও মোটর নিয়ে বেরিয়ে আউটরাম ঘাটের হাওয়া খেয়ে আসা চাই-ই। তারপর ওখান থেকে ফিরে প্রাতরাশ ইত্যাদি সম্পন্ন করেন।

মুখ-হাত ধুয়ে, পোশাক-পরিচ্ছদ পরিবর্তন করে ওঁরা দুজন ওপর থেকে নেমে এলেন নীচে, তারপর সদর দরজা খুলে গ্যারেজের সামনে যেতেই দেখলেন, গ্যারেজের কাঠের দরজার ওপর একটা ছোরা বিঁধে রয়েছে, আর সেই ছোরার সঙ্গে সুতায় বাঁধা ঝুলছে একটা লাল রঙের কাগজ!

দেখেই দুজনের শরীর গরম হয়ে উঠলো। সেন তাড়াতাড়ি ছোরাটা টেনে নিয়ে কাগজখানার ভাঁজ খুলে দেখলেন, তাতে লেখা রয়েছে :

তোমাদের রাতের কথাবার্তা সবই শুনেছি আমি। তোমরা প্রাণের ভয়ে খুবই ভীত হয়ে পড়েছো বুঝতে পারছি। প্রাণের ভয় তোমাদের অবশ্যই আছে। তবে কথা দিচ্ছি পনেরো তারিখ পর্যন্ত তোমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ! সুস্থ মস্তিষ্কে দেবব্রতবাবুকে বাঁচাবার উপায় স্থির করো। তারপর তোমাদের পালা!

অক্টোপাস

—অদ্ভুত!

চিঠিখানা পড়ে সেনের মুখ দিয়ে শুধু এই একটি কথা বেরিয়ে এলো।

সাত

পনেরোই মার্চ

বহু-আকাঙ্ক্ষিত পনেরো তারিখ !···

রাত দশটা বাজতে আর মিনিট পাঁচেক মাত্র বাকি। দেবব্রত রায় চৌধুরীর বিরাট বাড়ী আলোয় আলো ! আলোর প্রাচুর্য এত যে, সূর্যদেবও লজ্জায় মাথা হেঁট করবেন এ আলোর কাছে ! শুধু আলো নয়—পুলিস-কনস্টেবল, দারোগা, ইন্‌স্পেক্‌টর সারা বাড়ীতে একেবারে গিশগিশ করছে। বাড়ীর মধ্যে এমন কোন জায়গা নেই, যেখানে পুলিস, দারোগা বা ইন্‌স্পেক্‌টর নেই ! কলকাতার সব থানা যেন উজাড় হয়ে এখানে এসে জমেছে।

ভিতরেই শুধু নয়, বাড়ীর বাইরেও চতুর্দিকে সশস্ত্র পুলিসের দল পায়চারি করে বেড়াচ্ছে ! তাদের জ্বলন্ত সন্ধানী চোখগুলো উত্তেজনায় চঞ্চল !···

দোতলার একটা ঘরে দেবব্রতবাবু। তিনি একা নন, আরও হু' জন সেখানে আছেন ! একজনের নাম বিনয় মুখার্জী, অপর জনের নাম অমল দাশগুপ্ত। এঁরা হুজনে সি-আই-ডি ইন্‌স্পেক্‌টর।···তিনজনে ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় তিনখানি চেয়ারে বসে নানা কথা-বার্তা কইছেন।···প্রত্যেকের মুখে-চোখে উদ্বেগের ছাপ।···কখন এবং কিভাবে এসে যে অক্টোপাস হানা দেবে, এইটেই তাঁদের চিন্তা।

সময় চলেছে হু-হু করে।···

এবং সময় যত এগিয়ে চলেছে, এঁদের উদ্বেগও তত গভীর হয়ে উঠছে !

দেখতে দেখতে সাড়ে দশটা বেজে গেল।···

বিনয় মুখার্জী বললেন দাশগুপ্তকে,—কৈ, এখনও তো অক্টোপাসের দেখা নেই !

তাচ্ছিল্যভরে দাশগুপ্ত বললেন,—পাগল ! সে আর এসেছে ! যে-ভাবে পাহারার ব্যবস্থা হয়েছে, সে এখানে ঘেঁষবে কি করে ? দূর থেকে আমাদের নমস্কার করে হয়তো এতক্ষণে চম্পট দিয়েছে !

—তা হলে সেনের কাছে সে হার মেনেছে বলতে হবে ?

—নিশ্চয় !

—সেন কিন্তু তার আবির্ভাবই চেয়েছিলেন।

—হুঁ, তার দেখা পাওয়া গেলে হয়তো তাকে অ্যারেস্ট করাও সম্ভব হতো !

একটু থেমে মুখার্জী বললেন,—দেখা যাক্, কি হয় শেষ পর্যন্ত। এখনও আধঘণ্টা সময় রয়েছে। খুব সম্ভব তার আবির্ভাব হবে ! কেননা, সে তার পণ রক্ষা করবেই এমন আভাস তার চিঠিতে পাওয়া গেছে !— তবে কাজে নামতে পারবে কিনা সন্দেহ হচ্ছে !

ঠিক এমন সময়ে ঘরে এলেন সেন। তাঁকে দেখে মুখার্জী বললেন, —এই যে সেন, আসুন। অক্টোপাসের আগমন তো এখনও হলো না ?

—তাই তো দেখছি।

এ কথা বলে সেন মুখার্জীর দিকে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেবব্রতবাবুর উপর পড়তেই ভ্রূ কুঞ্চিত হলো। মুখার্জীর দিকে চেয়ে তিনি বললেন,—চলুন, দেবব্রতবাবুর ওখানটা ঘুরে আসি একবার।

সেনের মুখের দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে মুখার্জী বললেন,—

কিন্তু এ সময় তাঁর কাছে যাওয়া খুব বিপজ্জনক, আপনিই বলেছিলেন একথা।

হেসে সেন বললেন,—ভয় নেই—আসুন।

একটু থেমে আবার বললেন,—বায় কোথায়?

—আপনার কথামত ছাদে আছেন।

—রবি?

—ছাদে।

—ঠিক আছে, আসুন।

কথা শেষ করে মুখার্জীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে, এবং মুখার্জীর পিছু পিছু সিঁড়ি বেয়ে নেমে সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে বাইরে এলেন। দাশগুপ্ত রইলেন দেবব্রতবাবুর কাছে।

রাস্তার ধারে অপেক্ষা করছিল একখানা মোটর গাড়ী। গাড়ীর দিকে এগিয়ে যেতে যেতে মুখার্জী বললেন,—আপনার গাড়ী তো?

—হ্যাঁ, উঠুন।

কোন কথা না বলে মুখার্জী ড্রাইভারের সীটে উঠে বসলেন, সেন বসলেন তাঁর পাশে।

সেনের কথামত গাড়ী উল্কার বেগে ছুটিয়ে দিলেন বিনয় মুখার্জী।···

লালবাজার পুলিস অফিসে পৌঁছুতে দেরি হলো না। গাড়ী থেকে নেমে ওঁরা দুজনে নির্দিষ্ট স্থান অভিমুখে রওনা হলেন।

মুখার্জী চলেছেন আগে আগে। একজন দারোগাকে দেখে তিনি তাঁর কানে কানে কি যেন বললেন মৃদুস্বরে। শুনে দারোগাবাবু বললেন,—আসুন।···ও, মিস্টার সেন! নমস্কার!

সেন হাসিমুখে প্রতি-নমস্কার জানালেন।

তুজনকে নিয়ে দারোগাবাবু এক লৌহ-দ্বারের সামনে এসে দাঁড়ালেন। দরজায় মোটা গরাদ।

দরজার সামনে একজন অস্ত্রধারী পুলিস ছিল পাহারায়। দারোগাবাবু তাকে আদেশ দিলেন,—দরজা খোলো।

পুলিস দরজা খুলে দিলে তুজনে ভিতরে এগিয়ে চললেন। জায়গাটা সুড়ঙ্গের মত।—তুপাশে কঠিন প্রাচীর, মাথার ওপর ছাদ।

হাত ত্রিশেক অগ্রসর হওয়ার পর অনুরূপ আর এক লৌহ-দরজা। পূর্বের মত সে দরজা খুলে তাঁরা আরও অগ্রসর হলেন।

কী ভীষণ নিস্তব্ধ জায়গা। বিজলী বাতি জ্বলছে বটে, কিন্তু নীরবতায় সে-আলোও কেমন যেন ম্রিয়মাণ!

খানিক অগ্রসর হওয়ার পর এক আলোকিত কক্ষের সামনে এলেন। তুজন বন্দুকধারী পুলিস দরজায় পাহারায় দাঁড়িয়ে।

তাঁদের দেখে পুলিস পথ ছেড়ে দিল। সেন, মুখার্জী এবং দারোগাবাবু ভিতরে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করে দেখলেন, কমিশনার সাহেব এবং প্রসিদ্ধ মোটর-ব্যবসায়ী দেবব্রত রায়চৌধুরীকে।

এখানে বলে রাখা প্রয়োজন বোধ করি, দেবব্রতবাবুর বাড়ীতে যে দেবব্রতবাবুকে দেখা গেছে, তিনি নকল! যিনি আসল, তাঁকে অতি সাবধানে এখানে এনে রাখা হয়েছে! সমস্ত বিপদ তুচ্ছ করেও যদি অক্টোপাস আক্রমণ করে, তা হলে সে প্রতারিত হবে, এই আশায়!···

ওদিকে দেবব্রতবাবুর বাড়ী থেকে সেন আর মুখার্জী মোটরে চড়ে যখন লালবাজারে রওনা হন, তার ঠিক মিনিট পাঁচেক পরে আর একখানা মোটর এসে থামলো দেবব্রতবাবুর বাড়ীর দরজায়।

গাড়ী থেকে নামলেন সেন! নেমে তিনি দরজার দিকে অগ্রসর হতেই যে কজন পুলিস দরজায় পাহারা দিচ্ছিল, তারা সসম্মানে পথ ছেড়ে দিলো।

সেন ভেতরে ঢুকলেন। তারপর দোতলায় উঠে নকল দেবব্রতবাবুর ঘরে প্রবেশ করতেই অমল দাশগুপ্ত সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, —কি হলো, ফিরে এলেন যে?—গেলেন না দেবব্রতবাবুর কাছে?

ততোধিক বিস্ময়ে সেন বললেন,—তার মানে?

হেসে দাশগুপ্ত বললেন,—আপনার দেখছি সব সময়েই রসিকতা!

—কি বলছেন আপনি?—সেনের কণ্ঠ উত্তেজিত।

—সোজা কথাই তো বলছি। এই মিনিট পাঁচেক হলো, মুখার্জীকে নিয়ে আপনি বেরিয়ে গেলেন দেবব্রতবাবুর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে, এরই মধ্যে নিশ্চয়ই তা ভুলে যান নি? কাজেই একে রসিকতা ছাড়া কি বলবো বলুন?

—দাশগুপ্ত!

সেন যেন আর্তনাদ করে উঠলেন!

বিস্ময়াভিভূত হয়ে দাশগুপ্ত তাকালেন সেনের দিকে।

সেন অতিমাত্রায় চঞ্চল হয়ে বলে উঠলেন,—শীগ্‌গির আসুন দাশগুপ্ত! এতক্ষণে হয়তো সব শেষ হয়ে গেছে! পাঁচ মিনিট আগে যাকে দেখেছেন, সে আমি নই,—সে অক্টোপাস!···

—অ্যাঁ!

আঁত্‌কে উঠলেন দাশগুপ্ত!

—হ্যাঁ, সে অক্টোপাস! নিশ্চয়! তার কাছে আমি আবার হেরে গেলাম!···কথা কইবার আর সময় নেই;—শীগ্‌গির আসুন!

সেন এক-রকম ছুট্‌তে ছুট্‌তেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। দাশগুপ্ত ছুট্‌লেন তাঁর পিছু পিছু।···

বাইরে মোটর দাঁড়িয়ে। দুজনে গিয়ে মোটরে উঠলেন। সেন বিদ্যুদ্বেগে গাড়ী ছুটিয়ে দিলেন লালবাজার অভিমুখে।···

কিছুদূর অগ্রসর হতে দেখেন, আর একখানা মোটর ছুটে আসছে তাঁদের দিকে। গাড়ীখানা কাছে আসতেই সেন চীৎকার করে উঠলেন,—কে ?

—আজ্ঞে, আমি।—মুখার্জীর কণ্ঠ শোনা গেল।

এবং পরমুহূর্তে ব্রেক কষার শব্দ।···

ক' সেকেণ্ডের মধ্যেই গাড়ী দুখানা থামলো পথের মাঝখানে!

গাড়ী থামিয়ে সেন নেমে পড়লেন। মুখার্জী তাঁর কাছে এসে হাজির হয়েছেন ততক্ষণে। সেনকে দেখে অত্যন্ত বিস্ময়ে তিনি বলে উঠলেন,—একি! আপনি? আপনি কেমন করে···

সেন বললেন,—একটু আগে, যে-লোকের সঙ্গে আপনি লাল-বাজারে গিয়েছিলেন, তার নাম অক্টোপাস!—সে অনুপ সেন নয়! আপনি শীগ্‌গির আসুন আমাদের সঙ্গে!

গাড়ীতে উঠতে ভুলে গিয়ে মুখার্জী বোকার মত জিজ্ঞাসা করলেন,—অক্টোপাস?

—হ্যাঁ। কোথায় সে এখন?

—লালবাজারে।

—শীগ্‌গির আসুন মোটর নিয়ে!

এই কথা বলে গাড়ীতে বসলেন সেন। গাড়ী আবার চলতে শুরু করলো।···

৬২ প্রাণ নিয়ে খেলা

মুখার্জীর গাড়ীও নড়ে উঠলো ওদিকে।···

লালবাজার পুলিস-অফিসের কম্পাউণ্ডে গাড়ী থামিয়ে দাশগুপ্তকে নিয়ে সেন ছুটতে ছুটতে ভিতরে ঢুকলেন। মুখার্জীও এসে হাজির হয়েছেন। তিনিও গাড়ী থেকে নেমে সেন আর দাশগুপ্তের পিছু পিছু ঢুকলেন ভিতরে।

দু-একজন পুলিস-কর্মচারী তাঁদের দিকে সবিস্ময়ে তাকালো। কিন্তু এঁদের খেয়াল নেই কোনদিকে।—দৌড়ুতে দৌড়ুতে লৌহ-দরজা দুটো অতিক্রম করে দেবব্রতবাবুকে যে ঘরে রাখা হয়েছে, সেই ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। ঘরে তখন আর কেউ নেই, চেয়ারে বসে আছেন শুধু দেবব্রতবাবু!—নিশ্চল—নিস্পন্দ।

—দেবব্রতবাবু!—সেন ডাকলেন অধীরকণ্ঠে।

উত্তর নেই।

সেনের সমস্ত শরীর কেমন অবশ হয়ে এলো। সেই সঙ্গে তাঁর মুখের উপর ফুটে উঠলো একটুকরো শুকনো হাসি। সে হাসিতে কী গভীর ব্যথা আর বেদনা।

অসহায় ভাবে দাশগুপ্ত বললেন,—তা হলে অক্টোপাসের জয়?

করুণ কণ্ঠে সেন বললেন,—হ্যাঁ। সে তার পণ রক্ষা করেছে। এত পাহারা, এত হুঁশিয়ারী, এত কৌশল, সব মিথ্যা হয়ে গেলো।

—দেবব্রতবাবু মারা গেছেন?—মুখার্জী বিস্ময়ে আতঙ্কে বলে উঠলেন।

—হ্যাঁ।···দেখতে পাচ্ছেন না? দেখে বুঝতে পারছেন না বোধ-হয়, না?···অক্টোপাসের ধারাই এই!—বাইরে থেকে কিছু বুঝবার উপায় থাকে না।

এমন সময় মুখার্জীর নজর পড়লো একটা লালরঙের কাগজের ওপর। কাগজখানা দেবব্রতবাবুর কোলের ওপর পড়ে রয়েছে। 'বোধ হয় অক্টোপাসের চিঠি'—বলে কাগজটা তুলে নিয়ে তিনি ভাঁজ খুললেন। 'হ্যাঁ, অক্টোপাসের চিঠি'—বললেন তিনি।

এমন সময় একজন পুলিসকে নিয়ে কমিশনার সাহেব সেখানে এলেন। এসেই বললেন,—এই নিন্ সেন, আপনার পুলিস।

সেনের মুখে ক্ষীণ হাসি···বললেন,—আমি তো আপনাকে পুলিস আনতে বলিনি স্যর,—বলেছে অক্টোপাস!

—কি বলছেন?—দু-চোখ বিস্ফারিত করে কমিশনার সাহেব বললেন।

—সত্য কথা বলছি স্যর! আমার ছদ্মবেশে অক্টোপাস এখানে এসেছিল তার কাজ হাসিল করতে! এবং আপনাকে আর মুখার্জীকে কৌশলে এখান থেকে সরিয়ে দিয়ে নির্বিঘ্নে সে তার কাজ শেষ করে চলে গেছে!

—সর্বনাশ! দেবব্রতবাবু মারা গেছেন?

—হ্যাঁ, দেখুন। দেখলেই বুঝবেন।

কমিশনার সাহেব বললেন,—এত কৌশল করেও—

—হ্যাঁ স্যর, এত কৌশল করেও আমরা ওঁকে রক্ষা করতে পারলাম না!

পাশ থেকে মুখার্জী বললেন,—শুনুন, চিঠিতে কি লেখা আছে।

—কিসের চিঠি, সেন?—সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন কমিশনার সাহেব।

—অক্টোপাসের চিঠি।

মুখার্জী চিঠিখানা পড়তে লাগলেন…দারুণ আগ্রহে শুনতে লাগলেন সকলে।…

চিঠিতে লেখা—

আমি আমার পণ রক্ষা করেছি সেন! এখন তোমাকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতেই হবে যে, আমার বুদ্ধির কাছে তোমার বুদ্ধি,—শুধু তোমার বুদ্ধি নয়, তোমাদের সমবেত বুদ্ধি পরাস্ত! কাজেই বুঝতে পারছো, আমাকে গ্রেফ্‌তার করবার জন্য তোমরা যে আশা করেছো, তা মরীচিকা মাত্র!—কোনদিন সে আশা সফল হবে না!…এখনও তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, তুমি নিরস্ত হও! আমার বিরুদ্ধে তুমি আর দাঁড়িও না। যদি আমার এই দ্বিতীয় অনুরোধও উপেক্ষা করো, তা হলে জানবে, তোমার পিছনে আমি 'মৃত্যুদূত' পাঠাবো। প্রমথেশবাবু এবং দেবব্রতবাবুর মতই পৃথিবী থেকে কখন অদৃশ্য হয়ে যাবে, কেউ টের পাবে না…এর আগের চিঠিতে লিখেছিলাম, এবার তোমাদের পালা। কিন্তু অনেক ভেবে চিন্তে এবারো তোমাদের ক্ষমা করলাম।

দ্বিতীয়বার অনুরোধ করার অভ্যাস আমার নেই। তোমাকে করলাম কেন, জানো? তোমার মত মাথাওয়ালা একজন ডিটেক্‌টিভ্‌ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে দেশের খানিকটা ক্ষতি হবে, তাই।

আমার যা বক্তব্য, তোমাকে জানালাম। এখন তুমি কি করবে, সেটা জানতে চাই।…আমি এখন তোমার বৈঠকখানা-ঘরে। তোমার অভিপ্রায় ফোনে জানাও। পুলিস নিয়ে আসবার চেষ্টা করো না,—সে চেষ্টা নিষ্ফল হবে!…

তোমার শুভার্থী
অক্টোপাস

চিঠি শুনে স্তম্ভিত হলেন সকলে। বেশ কিছুক্ষণ কারো মুখে একটি কথা নেই। শুধু মিস্টার সেন অবিচল···অকম্প···মনে চিন্তার লহর।

নিজেকে খানিকটা সংবরণ করে নিয়ে কমিশনার সাহেব সেনের দিকে চাইলেন, বললেন—অক্টোপাস এখন আপনার বাড়ীতে!

—হ্যাঁ, আমার বাড়ীতে এবং আমারই বৈঠকখানায়। দেখুন, অদৃষ্টের কি পরিহাস! বাড়ীতে রবি যদি থাকতো, তা হলে সে হয়তো তাকে চিনতে পারতো। কিন্তু সে নেই। সে আছে দেবব্রতবাবুর ওখানে। বাড়ীতে থাকবার মধ্যে আছে একটা চাকর আর রাঁধুনী। আপনারাই যখন অক্টোপাসকে কিছুমাত্র সন্দেহ না করে তাকে সেন বলে মেনে নিয়েছিলেন, তখন তারা তো নেবেই!

—হুঁ। কিন্তু এখন তাকে আপনি কি বললেন?

—যা বলবো, শুনতে পাবেন।···চলুন আপনার ঘরে।

কমিশনার সাহেবের পিছু পিছু সকলে এলেন কমিশনারের খাস-কামরায়। এসে সেন রিসিভার নিলেন হাতে, ফোন করলেন,—হ্যালো!···হ্যাঁ, আমি অনুপ সেন। শোনো অক্টোপাস, তোমার কাছে আমি হার স্বীকার করছি। না করে উপায় নেই। কিন্তু এটুকু জেনো, নিরস্ত হবার মানুষ আমি নই! তোমার যা খুশি, তাই করতে পারো! তোমার হাতে যত মৃত্যুদূত আছে, তাদের প্রত্যেককে আমার পিছনে লেলিয়ে দিতে পারো, তাতে আমার একটুও আপত্তি নেই! আমি নিরস্ত হবো সেদিন, যেদিন তোমাকে গ্রেফ্তার করবো। নমস্কার!

এই বলে সেন সশব্দে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন।

খানিকক্ষণ নীরব থাকার পর কমিশনার সাহেব বললেন,—অক্টোপাস এমন দুর্জয়, এমন বেপরোয়া, এ আমি কল্পনা করতে পারিনি সেন! এ যে ভয়ানক কাণ্ড! এবং তার ছদ্মবেশ ধারণ করবার ক্ষমতাও অসাধারণ বলতে হবে।

সেন বললেন,—আমিও এতটা বুঝতে পারিনি স্যর! সে যে অসাধারণ, আগে অবশ্য তা জানতে পেরেছিলাম। কিন্তু এত অসাধারণ, তা বুঝিনি!

—এই পরাজয়ে আমাদের কতখানি মাথা হেঁট হলো, সেন! শুধু মাথা হেঁট নয়,—জনসাধারণের কাছে আমাদের যোগ্যতা অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হলো!

—সব বুঝতে পারছি স্যর। কিন্তু কি করা যাবে বলুন? চেষ্টার ত্রুটি হয়নি!

—হুঁ! একটা নিশ্বাস ফেলে কমিশনার সাহেব চুপ করলেন।

—শুধু ত্রুটি কি, চেষ্টার অতিরিক্ত করা হয়েছে স্যর।—মুখার্জী বললেন।

কমিশনার সাহেব বললেন,—তা আমি স্বীকার করছি মুখার্জী। এ পরাজয় আমাদের ত্রুটির জন্য হয়নি,—হয়েছে অক্টোপাসের দুর্জয় সাহস আর ব্রেইনের জন্য!

চা এলো। কমিশনার সাহেব প্রত্যেকের দিকে এক এক পেয়ালা এগিয়ে দিয়ে নিজে একটি পেয়ালা নিলেন।

পেয়ালায় দু-এক চুমুক দিয়ে কমিশনার সাহেব বললেন,—দেবব্রতবাবুকেও বিষের সাহায্যে খুন করা হয়েছে বলে আপনার ধারণা?

সেন বললেন,—হুঁ, আমার তাই বিশ্বাস।

—কিন্তু এক্ষেত্রে লজেঞ্জ বা অন্য কোন খাবারে বিষ মিশিয়ে খেতে দেওয়া হয়নি নিশ্চয়?

—আপনার অনুমান সত্য। খুব সম্ভব ইন্‌জেক্‌শন বা ঐ রকম কোন উপায়ে তাঁর শরীরে বিষ প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়েছে! যেমন ধরুন, খুব সূক্ষ্ম লোহার তার বা নীড্‌লের ডগায় বিষ মাখিয়ে সেটা তাঁর গায়ে ফুটিয়ে দেওয়া হয়েছে!···এই ধরনের যে কোন উপায়ে অক্টোপাস এক্ষেত্রে কাজ সেরেছে।

—তা হবে!—কমিশনার সাহেব নীরব হলেন।

অত বড় কামরা নীরব নিস্তব্ধ!

হঠাৎ সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কমিশনার সাহেব বললেন,—কিন্তু অক্টোপাস যদি আর কিছুদিন সময় পায়, তা হলে সে বহু লোক খুন করে ফেলবে, মিস্টার সেন!

—বিচিত্র নয়!—সেন নির্বিকার নির্লিপ্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন।

—উপায়?

সেন নীরব!

কমিশনার সাহেব ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে বললেন,—যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি একটা উপায় স্থির না করলে নয়, মিস্টার সেন!···আচ্ছা, আপনি কোন আশা দিতে পারেন না?

কথাটা বলে উদ্‌গ্রীব ভাবে তিনি চেয়ে রইলেন সেনের দিকে!

কুণ্ঠিতস্বরে সেন উত্তর দিলেন,—আই রিগ্রেট, কোনো আশা আপনাকে এখন দিতে পারছি না, স্যর!

সেনের কথায় কমিশনার সাহেব রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। শুধু তিনি নন, চিন্তিত হলেন সকলেই।

তবে কি অক্টোপাস বিজয়-গর্বে সহরের বুকে এমনি হত্যালীলা চালিয়ে যাবে ?—যা মনে করবে, তাই সে এমন অনায়াসে করে যাবে ! …ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে, কে জানে ?…

সেন আর অপেক্ষা করলেন না। কমিশনার সাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মুখার্জী এবং দাশগুপ্তকে বললেন,—আপনারা কেউ যাবেন নাকি ?

মুখার্জী বললেন,—এখন আর যাওয়া হয় কি করে ? লাশের ব্যবস্থা আছে। আপনি কিন্তু সাবধানে যাবেন, মিস্টার সেন ! কিছু বলা যায় না, যদি অক্টোপাস পথে হঠাৎ আক্রমণ করে ? এমনও হতে পারে যে, সে হয়তো এখনও আপনার বাইরের ঘরে বসে আছে আপনার প্রতীক্ষায় !

—তা যদি থাকে, তাতে ক্ষতি কি ? সেন বললেন হাসিমুখে।

—না, না, রসিকতা নয়, মিস্টার সেন !

—আহা, আমিই কি বলছি, আপনি রসিকতা করছেন ! মানে, অক্টোপাসের পক্ষে এখনও আমার ঘরে বসে থাকা সত্যই আশ্চর্য নয় ! কিন্তু আমি বলছি, সে যদি সত্যই বসে থাকে, তাতে ক্ষতি কি ? বরং লাভ আছে।—তার সঙ্গে মুখোমুখি ছুটো কথা বলবার সুযোগ পাবো !…এতে ভালো ছাড়া মন্দ কি হবে ? আমাদের কাজের বহু সুবিধা হয়ে যাবে তাতে। একটা সুযোগ…

—সুযোগ তো পাবেন ! কিন্তু সে যদি…

বাধা দিয়ে সেন বললেন,—ভয় নেই ! এত সহজে অনুপ সেনকে সে মারতে পারবে না !

—ধন্যবাদ! কমিশনার সাহেব বললেন হেসে।

সেন আর কোন কথা না বলে বেরিয়ে এলেন। তারপর মোটরে চড়ে রওনা হলেন দেবব্রতবাবুর বাড়ীর দিকে।

আট

অক্টোপাসের শেষ আলিঙ্গন

দিন চারেক পরের কথা।

রাত্রি সাড়ে দশটা···

ওপরের লাইব্রেরী-ঘরে সেন একা বসে। হাতে একখানি ইংরেজী বই। বইখানি তিনি মন দিয়ে পড়ছেন।

হঠাৎ সিঁড়িতে দ্রুত পদশব্দ···শব্দ ওপরে আসছে! সেন শুনলেন, শুনে তিনি চমকে উঠলেন!···সিঁড়ি বেয়ে তাড়াতাড়ি কে আসছে ওপরে উঠে!···

টেবিলের উপর বইখানি উলটে রেখে তিনি বারান্দায় এলেন। এসে সিঁড়ির দিকে তাকাতেই দেখেন, রবি।

রবিকে দেখে সেখান থেকেই সাগ্রহে তিনি প্রশ্ন করলেন,—ব্যাপার কি?

রবি ততক্ষণে সিঁড়ি পার হয়ে বারান্দায় এসেছে। সেনের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে উৎফুল্ল কণ্ঠে সে বললো—ঘরে চলো, বলছি।

আর কোন প্রশ্ন না করে রবির সঙ্গে সেন আবার লাইব্রেরী ঘরে-

প্রবেশ করলেন, এবং আসন গ্রহণ করে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকালেন রবির দিকে।

রবি বললো,—তোমার অনুমান সত্য, অনুপদা।

বলে সেনের সঙ্গে ফিস্‌ফিস্ করে নানা কথা কইতে লাগলো। তাদের সেই সতর্ক কথোপকথনের একটি বর্ণ বুঝা না গেলেও, এটুকু বুঝতে বিলম্ব হলো না যে, তাদের এ আলোচনা খুব গোপনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ।

প্রায় মিনিট পনেরো ধরে তুজনের আলোচনা-পরামর্শ চললো। তারপর স্বাভাবিক কণ্ঠে সেন বললেন,—তা হলে এখনি একটা বিপদ ঘটবে—এঁ্যা ?

—হ্যাঁ, তাই মনে হচ্ছে !—রবি বললো চিন্তান্বিত কণ্ঠে।

হঠাৎ টেলিফোনের আওয়াজ। ফোন আছে শয়ন-ঘরে। সেন রিসিভার ধরতে গেলেন। রবি সেইখানে বসে রইলো।

মিনিট-কয়েক পরে সেন ফিরে এসে বললেন,—যা ভাবা গেছে !

—অর্থাৎ ?

—অর্থাৎ তুর্ঘটনা ঘটেছে ! কার্ল মারা গেছেন ! বাড়ির অফিস-কামরায় বসে প্রমথেশবাবুর মত হিসেব-নিকেশ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, এমন সময় অক্টোপাস তাঁকে খুন করেছে।

— বেচারী ! একেবারে ছেলেমানুষ ! বয়স হবে বড় জোর ত্রিশ বছর ! উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ! অথচ এরই মধ্যে সব শেষ হয়ে গেল ! এমন নিষ্ঠুর মৃত্যু ! সত্যি, অবিলম্বে অক্টোপাসকে গ্রেফতার করতে না পারলে এ ভাবে আরও কত তরুণ প্রাণ যে নষ্ট হবে, কে জানে ?

উত্তরে কিছু না বলে সেন চুপ করে রইলেন।

রবিও চুপ করে ছিল। হঠাৎ কথার গতি পাল্‌টে দিয়ে সে বললো, —ফোন করলো কে ?

—ঘোষ।

—তিনি কোথায় ?

—কার্ল সাহেবের ওখানে।

—তোমাকে সেখানে যেতে বললেন ?

—হ্যাঁ। শুধু আমাকে নয়, তোমাকেও। এক-মিনিট দেরি নয় ···বললেন, এখনি আমরা দুজনে যেন সেখানে···ঘোষ আরও বললেন, যাবার সময় আমরা যেন মুখার্জীকে তাঁর বাড়ী থেকে তুলে নিয়ে যাই···তাঁর মোটর নাকি খারাপ হয়ে গেছে···ঘোষ ওঁকেও ফোন করেছেন, তিনি আমাদের জন্য অপেক্ষা করবেন।

দুজনে বেশ-ভূষা পরিবর্তন করে বেরুতে যাবেন, এমন সময় ইন্‌স্পেক্টর অমল দাশগুপ্ত এসে হাজির হলেন। সেন বললেন,—আসুন মিস্টার দাশগুপ্ত। আশা করি, কার্ল সাহেবের ওখানে যাবার জন্যই আপনার আগমন ?

—তাই। দাশগুপ্ত বললেন।

সেন বললেন,—কিন্তু আমার যেতে একটু বিলম্ব হবে। কারণ মুখার্জীর বাড়ী হয়ে আমাকে যেতে হবে। তাঁর গাড়ী খারাপ হয়ে গেছে। তাঁকে তুলে নিয়ে তবে কার্ল সাহেবের ওখানে যাবো।··· আপনি বরং এক কাজ করুন। রবিকে নিয়ে আপনি আর দেরি না করে চলে যান। আমি মুখার্জীকে নিয়ে ঘুরে যাচ্ছি।

—বেশ, তাই হোক।

—চলুন, আর দাঁড়িয়ে কাজ নেই।

তিনজনে-বেরুলেন।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে দাশগুপ্ত বললেন,—অক্টোপাসের উপদ্রব কি রকম চরমে উঠেছে, দেখতে পাচ্ছেন সেন!

সেন বললেন,—চোখ এবং কান দুটো যতক্ষণ আছে, সব দেখতেও পাবো, শুনতেও পাবো।

একটু থেমে দাশগুপ্ত বললেন,—মাত্র কদিনের মধ্যে ছ-ছটা খুন করলো! এ কি সহজ কথা!—একেবারে অস্বাভাবিক ব্যাপার! এমন খুন এর আগে আর কোথাও দেখিনি, বাবা! শুনেছি বলেও মনে পড়ে না! অক্টোপাস যে কাণ্ড দেখাচ্ছে, এর তুলনা নেই!

হেসে সেন বললেন,—নতুন কিছু করাই ওর বিশেষত্ব, দাশগুপ্ত! প্রত্যেক কাজে নতুন কিছু দেখাতে না পারলে যেন ওর তৃপ্তি হয় না! কাজ হাসিল করা ওর একমাত্র লক্ষ্য নয়,—প্রতি পদে পুলিসকে আর আমাকে অপদস্থ করাতেই ওর আনন্দ!

কথা বলতে বলতে তাঁরা রাস্তায় এসে পৌঁছালেন! সামনে ফুট-পাথের কোল ঘেঁষে দুখানা মোটর দাঁড়িয়ে। একখানা সেনের অপর-খানা দাশগুপ্তর।

সেনের নতুন কেনা গাড়ীর দিকে তাকাকে তাকাতে দাশগুপ্ত বললেন,—গাড়ীখানা আপনি যেদিন কিনেছেন, সেইদিন থেকেই আপনার গাড়ীটাতে চড়বার কি লোভ যে আমার জন্মেছে, সেন! কিন্তু এ-পর্যন্ত তা আর হয়ে ওঠেনি। কিছু যদি মনে না করেন, তা হলে…

সেন বললেন,—বাপ্‌স্! গাড়ীটাতে একটু চড়বার জন্য আপনি যে ভাবে গৌরচন্দ্রিকা শুরু করেছেন, তাতে আপনার চেয়ে আমারই

লজ্জা হচ্ছে বেশি! যাক…আর বিলম্ব নয়, আপনি রবিকে নিয়ে উঠে পড়ুন। আমি চলি।

এ-কথা বলে তিনি দাশগুপ্তের গাড়ীতে চড়ে স্টার্ট দিলেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই গাড়ীখানা অদৃশ্য হয়ে গেল।

এদিকে রবিকে নিয়ে দাশগুপ্ত বসেছেন সেনের গাড়ীতে। তিনি ড্রাইভারের সীটে আর রবি তাঁর পাশে। তিনিও গাড়ী চালিয়ে দিলেন! জনহীন রাজপথের উপর দিয়ে দুখানা গাড়ী ছুটলো তীরের বেগে। সেন যেদিকে গেলেন, এঁরা চললেন তার বিপরীত দিকে।

গাড়ী চালাতে চালাতে দাশগুপ্ত বললেন,—সত্যি, চালিয়ে আরাম আছে! এরকম গাড়ী না হলে কি ড্রাইভিংয়ে সুখ?

রবি জবাব দিলো,—আরাম কি সাধে লাগছে? এটার দাম দিতে পুঁজি ফাঁক হয়ে গেছে! গাড়ী কেনা নয় তো, টাকার শ্রাদ্ধ!

—উঃ— সহসা মৃদু আর্তনাদ করে দাশগুপ্ত পিঠের এক জায়গায় হাত দিয়ে জোরে জোরে চুলকোতে লাগলেন।

—কি হলো?—রবির সোৎসুক প্রশ্ন!

রবির কথায় জবাব না দিয়েই দাশগুপ্ত বললেন,—আপনারা সাংঘাতিক লোক তো মশাই!

—কেন? কি হলো?

—হবে আবার কি?…রাজ্যের ছারপোকা এনে পুষেছেন গাড়ীর মধ্যে!

—ছারপোকা! বলেন কি! ইঃ, তাইতো!

বলে রবি নিজের পিঠের এক জায়গায় হাত দিয়ে চুলকোতে শুরু করলো!

—দেখলেন তো! হাতে হাতে প্রমাণ!

—তাইতো দেখছি! অচিরে বেটাদের ঘায়েল করতে না পারলে নিরীহ ভদ্রলোকদের অকারণে যখন-তখন কষ্ট দেবে তো। না, এ ভালো নয়!

রবির এ রসিকতায় যোগ না দিয়ে দাশগুপ্ত কেমন যেন নীরব হয়ে গেলেন! কারণও আছে। কারণটা হল এই; হঠাৎ তাঁর মনে হলো, শরীরটা যেন ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে আসছে।···

গা-হাত-পা বেশ করে নেড়ে-চেড়ে নিয়ে ঝিমিয়ে-পড়া ভাবটাকে দূর করবার চেষ্টা করলেন দাশগুপ্ত। কিন্তু পারলেন না,—শরীর ক্রমশঃ অবশ হয়ে আসতে লাগলো! মনে কেমন আতঙ্ক জাগলো!···

কথাটা প্রকাশ করা প্রয়োজন ভেবে তিনি রবিকে বলতে যাবেন, ঠিক সেই সময় রবি বললো,—আচ্ছা মিস্টার দাশগুপ্ত, আমার শরীরটা হঠাৎ যেন ক্লান্ত হয়ে আসছে বলে মনে হচ্ছে, কেন বলতে পারেন?

চমকে দাশগুপ্ত বললেন,—আপনার শরীরও ঝিমিয়ে আসছে? আশ্চর্য!

ভয়ে এবং বিস্ময়ে রবি বলে উঠলো,—কেন, আপনারও?—

—হ্যাঁ, আমারও শরীর যেন অবশ হয়ে আসছে! হাত-পা কেমন যেন আড়ষ্ট! আমার কি মনে হচ্ছে জানেন?—ওটা ছার-পোকার কামড় নয়···কোন বিষাক্ত প্রাণী হয়তো···

তাঁর কথার শেষ দিকটা কেমন জড়ানো!

—বিষাক্ত প্রাণী! তা যাক, যা হবার তা হবে, আপনি গাড়ী থামান।

রবিও কথাগুলো জড়িয়ে জড়িয়ে বললো! দুজনের কথা শুনে

মনে হলো, ওদের গলার স্বর যেন বন্ধ হয়ে আসছে! শুধু গলার স্বর নয়—দেহের অবস্থাও যেন কেমন। মনে হচ্ছে, হৃৎপিণ্ডের কাজ বুঝি অচিরে বন্ধ হয়ে যাবে! দাশগুপ্ত তবু গাড়ী চালাতে লাগলেন।

রবির জড়ানো স্বর শোনা গেল আবার। সে বললো,—শরীর যদি খুব খারাপ মনে হয়, গাড়ী থামিয়ে ফেলুন। আর এগিয়ে দরকার নেই। আমার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে আসছে!

দাশগুপ্তর মুখে কোন জবাব নেই। গাড়ী আস্তে আস্তে থেমে গেল পথের মাঝখানে। ফুটপাথের পাশে নিয়ে গিয়ে থামাবার মত অবস্থা তাঁর ছিল না!

গাড়ী থামতেই পিছনকার সিটের দিক থেকে বলিষ্ঠ একখানা হাত ধীরে ধীরে দাশগুপ্ত এবং রবির চোখের সামনে এগিয়ে এলো।

—কে?—বলে দুজনে আঁত্‌কে উঠলেন!

সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড অট্টহাস্য। পিছনের সিট থেকে কে একজন বলে উঠলো,—অক্টোপাসের গুপ্তচর! কিন্তু তোমাদের একটা অনুমান মিথ্যা হয়েছে। কোন বিষাক্ত প্রাণী তোমাদের কামড়ায়নি। —কে কি করেছে জানো? এই ছাখো!

রবি এবং দাশগুপ্ত দুজনে আতঙ্কিত বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে দেখেন, লোকটির এগিয়ে-দেওয়া হাতের মুঠোয় চিক্‌-চিক্‌ করছে ইন্‌জেক্‌শনের ছোট একটা সিরিঞ্জ।

তবে…তবে কি তাঁদের শরীরেও সেই ভয়ানক মারাত্মক বিষ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে?…তা যদি হয়ে থাকে, তা হলে…

চিন্তা করবার অবস্থা তাঁদের আর রইলো না,—দুজনের দেহ অসাড়।…

নয়

আগামী শিকারের নোটিস

বিনয় মুখার্জীকে সঙ্গে নিয়ে সেন যখন লব্ধপ্রতিষ্ঠ মোটর-কারবারী কার্লের প্রকাণ্ড প্রাসাদে এসে পৌঁছুলেন, রাত তখন প্রায় সাড়ে এগারোটা।

খোলা ফটকের মধ্য দিয়ে গাড়ী এনে সেন গাড়ীবারান্দার তলায় এসে পৌঁছুলেন। সেখানে আরও চার-পাঁচখানি মোটর দাঁড়িয়ে আছে। তিনি নিজের অর্থাৎ দাশগুপ্তর গাড়ীখানা সেখানে দাঁড় করিয়ে দু-একবার পিঁক্ পিঁক্ করে হর্ন বাজালেন, বাজিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

আওয়াজ পেয়ে সি-আই-ডি ইন্‌স্পেক্টর রাজেন ঘোষ এসে তাঁদের সাদর-আহ্বান জানালেন; এবং তাঁদের সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন তেতলায়,—কার্লের অফিস-কামরায়।

প্রকাণ্ড ঘর। ঘরে অনেকগুলো বড় বড় সার্শি খড়খড়ি। ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে ঘর। বাছাই-করা কটামাত্র দেশী-বিদেশী আসবাব-পত্রে অতি পরিপাটি করে সাজানো। দেখে কার্লের পরিচ্ছন্ন ও মার্জিত রুচির প্রশংসা না করে পারা যায় না। ঘরখানা সত্যিই উপভোগ করবার মত! কিন্তু এখন?…ঘরের সব সৌন্দর্য যথারীতি বজায় থাকা সত্ত্বেও বিভীষিকায় পরিপূর্ণ! যাঁর ঐকান্তিক যত্নে এ-ঘর এমন সুন্দর হয়ে উঠবার সুযোগ পেয়েছে, তিনি—এই বাড়ীর মালিক আজ অক্টোপাসের হাতে মৃত্যুবরণ করেছেন! তাঁর দেহ এখনও ঘরে পড়ে রয়েছে।

কার্লের অবস্থা দেখে বোঝা যায় না, তিনি মারা গেছেন!—যেন ঘুমোচ্ছেন। প্রমথেশবাবু এবং দেবব্রতবাবুর ক্ষেত্রে যে-রকম ব্যাপার ঘটেছিল, এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাই!—তিনি বসে আছেন চেয়ারে, আর তাঁর দেহসমেত মাথা নুয়ে পড়েছে সামনের টেবিলের ওপর!···

ক্ষণকাল একাগ্রদৃষ্টিতে মৃতের দিকে তাকিয়ে থাকার পর সেন প্রশ্ন করলেন ঘোষকে,—ইনি কি ভাবে খুন হলেন আপনার মনে হয়?

ঘোষ বললেন,—মনে হওয়া নয়। আসামী প্রমাণ রেখে গেছে, কি ভাবে সে খুন করেছে। আঙুল ছয়েক লম্বা একটা ছোট্ট তীরের ফলায় বিষ মাখিয়ে সেই তীর ছুড়ে এঁকে মারা হয়েছে! এই দেখুন, জায়গাটা আপনাকে দেখিয়ে দিই।

কথা শেষ করে ঘোষ কার্লের পিঠ থেকে জামা সরিয়ে ক্ষত-স্থান দেখালেন সেনকে, বললেন,—এই জায়গায় তীরটা বিঁধে ছিল। আমি এসে তীরটা তুলি।

সেন শুধোলেন,—কোথায় সে তীর?

—নীচেকার ড্রইংরুমে রেখেছি। নিয়ে আসবো সেটা?

—থাক্, নীচে গিয়ে দেখবো।

সেন নীরব হলেন।

—কিছু বুঝলেন—রাজেন ঘোষ উৎসুকভাবে সেনের মুখের দিকে তাকালেন।

—নতুন কিছু বুঝিনি। আপনি যা বুঝেছেন, আমিও তাই বুঝেছি।—সেন বললেন।

—অর্থাৎ? কিছুই তো বুঝলাম না!—অবাক হয়ে যান রাজেন ঘোষ।

—অর্থাৎ, আমি এইটুকু বুঝেছি যে অক্টোপাস পিছন দিককার ওই খড়খড়ির বাইরে থেকে তীরটি ছুড়েছে।...

সেন আর কোন কথা না বলে নিহত কার্লের হাতের নাড়ী পরীক্ষা করলেন।

—হ্যাঁ, একটা কথা!—বলে ঘোষ নিজের শার্টের পকেট হাতড়াতে লাগলেন।

সেন কার্লের নিস্পন্দ হাতখানা ছেড়ে দিয়ে ঘোষের দিকে তাকালেন।

—অক্টোপাস একখানা চিঠি দিয়েছে...তার আগামী শিকারের নোটিস!

—দেখি।

পকেট থেকে লাল রঙের একখানা কাগজ বার করে সেখানা তিনি সেনের হাতে দিলেন। কাগজে মাত্র একটি লাইন লেখা:

আমার আগামী শিকার জন সাহেব।

অক্টোপাস

কাগজটা পকেটে রেখে সেন বললেন,—চলুন, এ-ঘরে থাকবার আর প্রয়োজন নেই। রবি আর দাশগুপ্ত কোথায়?

রাজেন ঘোষ বললেন,—কৈ, তাঁদের তো দেখিনি......তাঁরা কি এসেছেন?

বিস্ময়ের সুরে সেন বললেন,—সে কি অনেক আগে তাদের এখানে পৌঁছুবার কথা।

মুখার্জী বলে উঠলেন,—আশ্চর্য! এখনও তাঁদের না আসবার কারণ কি?

ঘোষ বললেন,—উঁহু, তাঁরা এখনও এসে পৌঁছান নি। আমি তো অনবরত খবর নিচ্ছি কে আসছেন, কে যাচ্ছেন···তাঁরা এলে আমার অজানা থাকতো না।

—তাহলে গেলেন কোথায়?—উদ্বিগ্ন কণ্ঠে মুখার্জী প্রশ্ন করলেন।

—ভাবনার কথা!—সেন চিন্তিত হলেন।

ঘোষ কি যেন একটু চিন্তা করে বললেন,—তাঁরা দুজনে এক-গাড়ীতে বেরিয়েছেন?

সেন বললেন,—হ্যাঁ। আপনার ফোন্ পেয়ে দাশগুপ্ত আমার ওখানে গিয়েছিলেন। রবিকে আমি তাঁর সঙ্গে এখানে পাঠিয়ে দিয়ে মুখর্জীর ওখানে চলে যাই। কিন্তু কেন বলুন তো?

—মানে···আমি ভাবছি পথে গাড়ী খারাপ হয়ে যায়নি তো?

—কিন্তু তাই বা কেমন করে হয়? ওঁরা আমার গাড়ীতে বেরিয়েছেন—আমি আসছি দাশগুপ্তর গাড়ীতে। আমার ও-গাড়ী ক'মাস আগে মাত্র কিনেছি। এর মধ্যে খারাপ হবে, এমন গাড়ী তো নয়।

খানিকক্ষণ চিন্তিতভাবে থাকার পর ঘোষ বললেন,—আর একটা কথা আমার মনে হচ্ছে সেন!

—কি, বলুন?

ঘোষ বললেন,—আপনার কাছে যে অমল দাশগুপ্ত গিয়েছিল, সে অক্টোপাস, কিংবা অক্টোপাসের কোন গুপ্তচর নয় তো?

উপেক্ষার হাসি হেসে সেন বললেন,—আমার চোখে ধুলো দেবে অক্টোপাস? উঁহু, তা সে পারবে না, এ বিশ্বাস আমার আছে।

কথা শেষ করে তিনি বেশ একটু অপ্রতিভ হলেন,—তাই তখনি আবার বললেন,—কথাটা বলে হয়তো অহংকার প্রকাশ করছি। সে জন্য আমি লজ্জিত।

মুখার্জী বললেন,—না, না, একে অহংকার বলে না সেন, এ হচ্ছে আপনার মনের দৃঢ়তা আর নিজের ওপর বিশ্বাসের কথা।

—যাক।—ওকথা চাপা দিয়ে সেন বললেন,—এখন আমার কি ভয় হচ্ছে জানেন? ভয় হচ্ছে, ওঁরা হয়তো পথিমধ্যে অক্টোপাসের হাতেই পড়েছে।

ঘোষ বললেন,—অসম্ভব নয়। এমন ঘটা খুব স্বাভাবিক!

—তা হলে উপায়?—মুখার্জী রীতিমত চিন্তা-কাতর হলেন!

তাঁর এতবড় গুরুত্বপূর্ণ কথার উত্তরে কেউ কোন কথা বললেন না। এর মানে এই নয় যে, তাঁরা একথা উপেক্ষা করলেন। জবাব দেবার মত কথা তাঁরা খুঁজে পেলেন না!

অনেকক্ষণ পরে সেন বললেন,—উপায়ের জন্য ভাবছেন মুখার্জী? তাঁরা যদি বেঁচে থাকেন, তা হলে উপায় একটা হবেই!

—কি বলছেন আপনি!—আতঙ্কে চোখ দুটো বড় করে মুখার্জী দিলেন জবাব।

—ঠিক করে আমি কিছু বলছি না মুখার্জী। তবে অক্টোপাসের কাছে মানুষের জীবনের কোন দাম নেই কিনা, তাই ভয় হচ্ছে!

এটুকু বলে সেন চুপ করলেন।

তাঁর-একথা শুনে আর কেউ কোন কথা বলতে পারলেন না; দৃষ্টি নত করে মেঝের দিকে চেয়ে রইলেন।

নীরবে এমনি কিছুক্ষণ থাকবার পর সেন নিশ্বাস ফেলে ঘোষকে

প্রাণ নিয়ে খেলা—
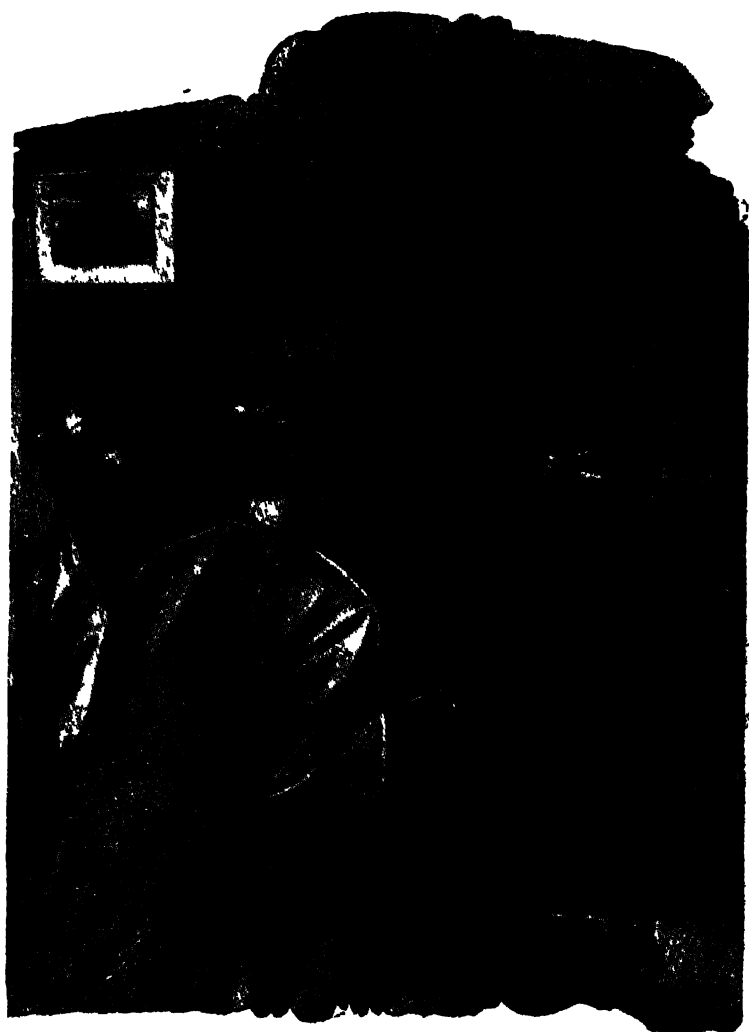
সাক্ষাৎ মৃত্যুর মত এক-পা এক-পা করে অতি সন্তর্পণে
অক্টোপাশ এগিয়ে আসছে…

বললেন,—ওকথা এখন যাক, কার্লের দিক থেকে যদি কিছু বলবার থাকে, বলুন।

ঘোষ বললেন,—হ্যাঁ, বিশেষ একটা প্রয়োজনীয় কথা আপনাকে এখনও বলা হয়নি!

—বলুন?

—কার্লের একজন বেয়ারা অক্টোপাসকে স্বচক্ষে দেখেছে।

—তাই নাকি?—বিস্মিত না হয়েই স্বাভাবিক কণ্ঠে সেন এ-কথা বললেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তা হলে চলুন, তার সঙ্গে একটু কথা কওয়া যাক!

—আসুন, নীচেকার ড্রইংরুমে তাকে পাবো খুব সম্ভব!

ড্রইংরুমে পৌঁছুতে বাঙালী বেয়ারা জগদীশের দেখা মিললো। জগদীশের সঙ্গে ঘোষ পরিচয় করিয়ে দিলে, সেন হাসিমুখে জগদীশকে বললেন,—তুমি বুঝি কার্ল সাহেবের এখানে কাজ করো?

বিনীতভাবে জগদীশ বললো,—হ্যাঁ, স্যর।

—শুনলাম, তুমি নাকি লোকটাকে দেখেছো, তোমার সাহেবকে যে মেরেছে?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ। মানে, আমি যাকে দেখেছি, আমার বিশ্বাস, সাহেবকে সে-ই খুন করেছে।

—বটে! ব্যাপারটা আমাকে একবার খুলে বলো তো! কোথায় তাকে দেখলে, কি রকম তাকে দেখতে, কি সে করেছিল?—এগুলো বেশ গুছিয়ে আমাকে বলো।

জগদীশ একটু থেমে বলতে শুরু করলো,—রাত তখন দশটা হবে।

আমি ঐ বারান্দা দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ সিঁড়ির দিকে নজর পড়তে আমার গায়ের রক্ত একেবারে জল হয়ে গেল! আব্ছা অন্ধকারে দেখি, ভূতের মত কালো একজন লোক খুব হুঁশিয়ার হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে নীচে। লোকটাকে দেখেই আমি তাড়াতাড়ি এই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। ঢুকে পড়ে ঐ যে জানলা রয়েছে, ঐ জানলার ফাঁক দিয়ে লোকটাকে দেখতে লাগলাম। বারান্দায় বা এঘরে তখন আলো জ্বলছিল না। কাজেই চারিদিক বেশ অন্ধকার হয়ে ছিল। এবং অন্ধকার ছিল বলেই লোকটা আমাকে দেখতে পায়নি। আবার আলো না থাকার জন্যও আমার মেজাজ গেল খারাপ হয়ে। কেননা, লোকটার চেহারা দেখতে চাই অথচ দেখবো কি করে? হঠাৎ একটা কাজ করে বসলাম। লোকটা সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেই বারান্দায় পা দিয়েছে, অমনি বারান্দার আলোর সুইচ্ টিপে দিলাম।...এবার স্পষ্ট দেখতে পেলাম তাকে। উঃ, কী ভয়ানক দেখতে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত সারা দেহ কালো কাপড়ে, কি ঐ রকম একটা কিছুতে ঢাকা। শুধু দেখা যাচ্ছিল তার নাক, আর চোখ দুটো। আরো দেখলাম, তার বুকের ওপর সেই কালো কাপড়ে মাকড়সার মত কি যেন একটা আঁকা রয়েছে সাদা রং দিয়ে!

জগদীশের যখন এই পর্যন্ত বলা হলো, তখন ঘোষ প্রশ্ন করলেন সেনকে,—ঐ মাকড়সার মত জীবটিই অক্টোপাস, কি বলেন সেন?

—হ্যাঁ...আচ্ছা, তারপর? আলো জ্বলতে দেখে লোকটা কি করলো?

জগদীশ বললো,—হঠাৎ আলো জ্বলতে দেখে, লোকটা থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়েই একবার চারিদিক দেখে নিলো। তারপর উর্ধ্বশ্বাসে

ছুট দিলো সদর দরজার দিকে। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল একখানা কালো রংএর মোটর-গাড়ী। লোকটা ছুটে গিয়ে সেই গাড়ীতে চড়তেই গাড়ীটা হাওয়ার মত চকিতে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল!...

লোকটা চলে যেতেই আমি ছুটলাম সাহেবের অফিস-কামরায়—সাহেবকে ব্যাপারটা জানাবার জন্য। গিয়ে দেখি, সাহেব টেবিলের ওপর মাথা রেখে ঝুঁকে আছেন। মনে হলো, তিনি ঘুমোচ্ছেন। কিন্তু চার-পাঁচবার ডেকেও কোন সাড়া পেলাম না!

এইটুকু বলতে জগদীশের সজল ছুটি চোখ থেকে হু-হু করে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো গাল পর্যন্ত! তার অবস্থা দেখে সেন বুঝলেন, আর দু-একটা কথা বলতে গেলে সে হয়তো কেঁদেই ফেলবে। তাই তিনি বললেন,—থাক, আর বলতে হবে না জগদীশ, এইটুকুই এখন যথেষ্ট।

এবার তিনি ইনস্পেক্টর রাজেন ঘোষের দিকে চেয়ে বললেন,—আচ্ছা, এবার তা হলে উঠি ঘোষ! আপনি লাশের ব্যবস্থা করুন।... আসি জগদীশ, সময়মত আবার দেখা হবে।

আর অপেক্ষা না করে মুখার্জীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি পথে নামলেন...

দশ

মরণের মুখে

অমল দাশগুপ্তের যখন জ্ঞান ফিরে এলো, রাত তখন তিনটে। এগারোটা থেকে তিনটে,—এই সুদীর্ঘ চার ঘণ্টা তিনি অজ্ঞান অচৈতন্য!

জ্ঞান ফিরে আসতে অনুভবে তিনি বুঝলেন, ভিজে স্যাঁতসেঁতে একটা ঘরের মেঝের উপর তিনি পড়ে আছেন। কিন্তু ঘরটা দেখতে কেমন, বা কি-কি আসবাব-পত্র আছে, এর কিছুই দেখতে পেলেন না। ঘর-ভরা বিশ্রী জমাট অন্ধকার শুধু!

কিন্তু রবি কোথায়?···ডান দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে দাশগুপ্তের হাতে ঠেকলো এক মনুষ্যদেহ। অনুমানে বুঝলেন, রবি! রবির জ্ঞান তখনও ফেরেনি। মেঝের উপর সে পড়ে আছে নির্জীব—নিস্পন্দ!···

দাশগুপ্ত তার নাকের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে বুঝলেন, জ্ঞান ফিরতে আর বেশী দেরি নেই।

কিন্তু দেরি না থাকলেও দশ-বারো মিনিটের আগে জ্ঞান হবে বলে মনে হলো না। চেষ্টা করলে হয়তো পাঁচ মিনিটের মধ্যেও চৈতন্য ফিরে আসতে পারে। রবির জ্ঞান তাড়াতাড়ি ফিরে আসুক, এই তিনি চান! কিন্তু এক্ষেত্রে এক-ঘটি জল, আর একখানা পাখা পেলে তবে তা হয়! কিন্তু এখানে জলই বা কোথায়, পাখাই বা

কোথায় ?···এখানে জল চাইলে মিলবে হয়তো বিষ ; আর পাখা চাইলে ছুটো লাথি !···

যাইহোক, আর শুয়ে না থেকে দাশগুপ্ত আস্তে আস্তে উঠে বসলেন। দেহে-মনে রীতিমত অবসাদ !···আর অবসাদ !···বাড়ীতে হলে মিলতো কমলা লেবুর রস, বেদানার রস, গরম ছুধ !···যা প্রয়োজন, সবই পাওয়া যেতো। আর এখানে ? ··শত্রুপুরীতে অবসাদ অনুভব করা লজ্জার কথা !

দাশগুপ্ত সবলে দেহের ক্লান্তি বিসর্জন দিয়ে হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে রবির মাথার কাছে বসলেন, এবং তার দেহটাকে ছু-একবার নাড়িয়ে, কোঁচার খুঁট দিয়ে তাকে হাওয়া করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রবির লুপ্ত চেতনা ফিরে এলো। চেতনা ফিরে আসতে সে চোখ মেলে চাইলো কিন্তু কিছু দেখতে পেলো না। ক্ষীণকণ্ঠে শুধু প্রশ্ন করলো,—কে ?

আমি অমল দাশগুপ্ত।—দাশগুপ্ত নীচু গলায় ধীরে ধীরে বললেন।

—আমি কোথায় ? এত অন্ধকার কেন ?

—একটু ভেবে দেখুন, সব বুঝতে পারবেন।

চিন্তা করলো রবি। তারপর বললে,—ও, অক্টোপাসের লোক বুঝি আমাদের এখানে নিয়ে এসেছে ?

—হ্যাঁ ঠিক। ওদের হাতে আমরা বন্দী !

—কোন্‌ জায়গা এটা, কিছু বুঝতে পেরেছেন ?

—না, কিছুই বুঝতে পারছি না। মোটকথা তাড়াতাড়ি এখান থেকে পালাতে না পারলে, আরও বেশী ভয়। এমন কি, শেষ-পর্যন্ত প্রাণ নিয়ে টানাটানি হতে পারে।

—হুঁ। বলে রবি ধীরে ধীরে মেঝের ওপর উঠে বসলো। তার দেহে-মনেও ভয়ানক দুর্বলতা!

দাশগুপ্ত বললেন,—এখান থেকে এখন উদ্ধার পাবার উপায়?

—আপনি ভাবেন, অক্টোপাস এমন কাঁচা লোক যে উদ্ধার পাবো মনে করলেই উদ্ধার মিলবে, এমন ঘরে সে আমাদের আটক করে রেখেছে?···অবশ্য চেষ্টা আমাদের করতেই হবে। কিন্তু তার আগে একটা আলোর দরকার যে! ঘরখানার চেহারা দেখতে হবে তো? আপনার কাছে দেশলাই আছে?

—ছিল। এখন নেই।

—তার মানে?

—খুব সম্ভব অক্টোপাসের লোকগুলো পকেট থেকে বার করে নিয়ে গেছে! শুধু দেশলাই-ই নয়, পকেটে কিছু রাখেনি—সেলাইটুকু ছাড়া। দেশলাই, রিভলভার, নোটবুক, পেন, এমন কি রুমালখানা পর্যন্ত বার করে নিয়েছে।···

নিজের পকেট কটা হাতড়ে রবি বললো—ইস্, আমার পকেট থেকেও সব গেছে, দেখছি!

—এখন উপায়?—দাশগুপ্ত ভাবনায় পড়লেন।

সহজ ভাবেই রবি বললো,—উপায় আর কি। না দেখেই যতদূর যা হয়!

বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়ালো, এবং সামনের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললো,—দেখি, দরজা-জানলার সন্ধান কিছু মেলে কি না? আপনিও একটু চেষ্টা করে দেখুন।

কথা শুনে দাশগুপ্তও পা বাড়ালেন।

হঠাৎ 'খট্' করে একটা শব্দ।

দাশগুপ্ত অন্ধকারে প্রশ্ন করে উঠলেন,—কি হলো?

রবির কণ্ঠ শোনা গেল,—কিছু নয়, একটা চেয়ারে ধাক্কা লেগেছে।

আবার নীরবতা।...কানে আসে শুধু দুজনের পায়ের মৃদু খস্ খস্ শব্দ।

কয়েক মুহূর্ত মাত্র! তারপরই সেই নিস্তব্ধতার বুক চিরে দাশগুপ্তের কণ্ঠস্বর জাগলো,—জানলার মতো কি যেন একটা হাতে ঠেকছে মিস্টার গুপ্ত!...হ্যাঁ, জানলা বলেই মনে হচ্ছে। এদিকে আসুন তো।

—যাই।

রবি কাছে এলে দাশগুপ্ত তার ডান হাতটাকে জানলার গায়ে ঠেকিয়ে দিয়ে বললেন,—এই দেখুন।

জায়গাটি স্পর্শ করে রবি বললো,—হ্যাঁ, জানলাই তো। দরজাটা আমার হাতে পড়েছিল। কিন্তু গায়ের জোরে টেনে কপাট দুটোকে এতটুকু ফাঁক করতে পারিনি! এখন দেখুন, এটাকে কোন রকমে খুলতে পারা যায় কি না?...এই যে...খিল পেয়েছি!

তারপর খট্াস করে শব্দ।

রবি জানলা খুলে ফেললো, এবং গরাদের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে জানলার বাইরের দিকটায় দৃষ্টিপাত করলো। কিন্তু জমাট অন্ধকার ছাড়া কিছুই সে দেখতে পেলো না। অন্ধকারের গভীরতা দেখে বুঝলো, এদিককার মত জানলার ওদিকেও একখানা ঘর আছে। ঘর দুটির মাঝামাঝি যে দেওয়াল, সেই দেওয়ালেই এ জানলা বসানো।

দাশগুপ্ত প্রশ্ন করলেন,—কি বুঝলেন?

জানলার কাছ থেকে মুখ সরিয়ে এনে রবি বললো,—বুঝছি, এ পাশেও একটা ঘর রয়েছে।···আচ্ছা, এক কাজ করা যাক।

—বলুন?

—দুজনে দুটো গরাদ ধরে বেঁকিয়ে ও-ঘরে যাবার ব্যবস্থা যদি করতে পারি? মনে হচ্ছে, বাঁকানো বিশেষ কষ্টকর হবে না।···নিন, ধরুন!

অল্প আয়াসেই দুটো গরাদ বেঁকিয়ে মানুষ যাবার মত পথ তৈরী হলো।

রবি বললো,—আপনি এখানে অপেক্ষা করুন, আমি ও-ঘরটা একবার দেখে আসি।

রবি গরাদের ফাঁক দিয়ে ও-পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

ও-ঘরে ঢুকে দেওয়াল ধরে খানিক যেতে দরজার সন্ধান পেলো। কিন্তু একই অবস্থা! দরজাটা খুলবার কোন উপায়ই সে উদ্ভাবন করতে পারলো না। বাইরের দিক থেকে দরজাটা বেশ মজবুত ভাবে আটকানো।

এ-দরজা ছেড়ে দিয়ে আর কোন নতুন দরজা-জানলা পাওয়া যায় কি না, এই আশা নিয়ে দেওয়াল ধরে ধরে আবার সে চলতে লাগলো।

দু-এক পা অগ্রসর হইতেই একটা গোল টেবিলের সঙ্গে ধাক্কা লাগলো। কিন্তু নেহাত খেয়াল-বশে টেবিলটায় কি আছে, জানবার অভিপ্রায়ে তার ওপর হাত দিতেই হাতে যা ঠেকলো, তাতে তার সারা দেহ আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো—সেখান থেকেই সে বলে উঠলো দাশগুপ্তকে উদ্দেশ্য করে,—একটা ফোন্ পেয়েছি মিস্টার দাশগুপ্ত!

দাশগুপ্তের হর্ষকম্পিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল,—সত্যি? ভগবানের অনুগ্রহ! আপনি তাড়াতাড়ি সেনকে ফোন্ করে দিন। আর বলে দিন, তিনি যেন এক্সচেঞ্জ অফিস থেকে এখানকার ঠিকানা জেনে নিয়ে এই মুহূর্তে আর্মড্ পুলিস নিয়ে এখানে চলে আসেন।

—হ্যাঁ, তাই বলি।—এই বলে রবি রিসিভার তুলে নিয়ে এক্সচেঞ্জ অফিসে সেনের নম্বর জানাতেই সংযোগ পেয়ে গেল। সংযোগ পেয়ে সে বললো—হ্যালো!···ও, অনুপদা?···হ্যাঁ, আমি রবি। অক্টোপাসের এক আড্ডা থেকে তোমার সঙ্গে কথা বলছি। এ আড্ডা কোন্ জায়গায়, আমি বলতে পারবো না। কেননা অক্টোপাস আমাদের অজ্ঞান করে এখানে নিয়ে এসেছে। তুমি টেলিফোন-অফিস থেকে এখানকার ঠিকানা জেনে তাড়াতাড়ি চলে এসো। আমরা দুজনেই এখন অক্টোপাসের হাতে বন্দী। নেহাত বরাত জোরে একটা সুযোগ পেয়ে গেছি, তাই তোমাকে ফোন করতে পারলাম।···হ্যাঁ যত তাড়াতাড়ি পারো, তুমি চলে এসো। সঙ্গে দু-একজন আর্মড্ গার্ড এনো।

রিসিভার নামিয়ে রাখলো রবি।

নামিয়ে রেখে আবার দরজা-জানলার সন্ধান করতে লাগলো। কিন্তু নতুন আর কোন দরজা-জানলা পেলো না। না পাক, ফোনের সন্ধান পেয়েছে, এই তাদের পরম সৌভাগ্য।···

ও-ঘরে আর অপেক্ষা না করে রবি গরাদের ফাঁক দিয়ে আবার এদিকের ঘরে ফিরে এলো, এসে দুজনে মিলে বাঁকানো গরাদ দুটো আবার আগের মত সোজা করে দিলো!

কাজ শেষ হলে কাপড়ের খুঁটে ঘাম মুছতে মুছতে দাশগুপ্ত

বললেন,—এতক্ষণে আমার নিশ্বাস পড়লো !···উঃ, কী দুর্ভাবনা যে হয়েছিল !

রবি বললো,—বিপদে পড়লে দুর্ভাবনা হয়েই থাকে দাশগুপ্ত ! নতুন কথা নয় !···যাক্, এখন তো দুর্ভাবনা অনেকটা কমলো ?

—তা কমেছে। কিন্তু পিপাসা যা পেয়েছে !

—তার জন্য ভাবনা কি ? আর কিছুক্ষণ পরেই বাড়ী গিয়ে যত-খুশী জল খাবেন !

হঠাৎ দরজায় খট্-খট্ করে আওয়াজ হলো। কে যেন তালা খুলছে !

দাশগুপ্তকে রবি বললো,—মেঝেয় শুয়ে পড়ুন। যেন এইমাত্র জ্ঞান হলো, এমনি ভাব দেখানো চাই !

কথা শেষ করেই রবি শুয়ে পড়লো। দাশগুপ্তও তখনি শুয়ে পড়লেন।···পর-মুহূর্তে সশব্দে দরজা খুলে গেল।

ঘরে ঢুকলো যমদূত-প্রায় গাঁট্টা-গোঁট্টা চেহারার তিনটে লোক। তাদের মধ্যে একজনের হাতে একটি লণ্ঠন, আর দুজনের হাতে মোটা মোটা দুটো লাঠি ! লাঠি দুটো দেখলে অন্তরাত্মা শুকিয়ে যায় !

লণ্ঠনধারী এগিয়ে এলো রবির কাছে, এসে হাসতে হাসতে বললো,—এই যে, গোয়েন্দাবাবুদের চেতনা হয়েছে দেখছি !···দয়া করে এবার ওঠো।

—কোথায় যেতে হবে ?—রবি জিজ্ঞেস করলো।

—ওরে বাবা, কথার দেখছি খুব বহর তো ! কোথায় যেতে হবে, তা দেখতেই পাবে ! আগে থেকে ব্যস্ত হয়ে লাভ কি ?···এখন ওঠো।

উচ্চবাচ্য না করে রবি উঠে দাঁড়ালো। দাশগুপ্তও উঠলেন।

তাঁরা উঠতেই লাঠিধারী গুণ্ডা দুটো এগিয়ে এসে তাঁদের দুজনকে ধরে হিড়্-হিড়্ করে টানতে টানতে ঘরের বাইরে নিয়ে এলো, এবং লম্বা বারান্দা দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চললো। লণ্ঠনধারী আসতে লাগলো পিছনে পিছনে।

বারান্দার শেষ প্রান্তের ঘর। ঘরখানা আকারে বেশ বড়—যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। কিন্তু জানলা নেই! শুধু গোটাকতক ভেন্টিলেটরের ছোট ছোট ফোকর আর বিরাট একজোড়া মজবুত কপাট ছাড়া আর কিছু নেই। এ ছাড়া আর একটা নতুন জিনিস নজরে পড়লো। পাঁচ-ছ হাত লম্বা লম্বা গোটা-চারেক মোটা লোহার রড্ দুহাত অন্তর অন্তর মেঝের উপড় খাড়া করে পুঁতে রাখা আছে। যেন সার সার লোহার খুঁটি পোঁতা হয়েছে। আরও দেখা গেল, সেই খুঁটিগুলির মধ্যে একটি খুঁটির সঙ্গে জোয়ান একজন লোককে লোহার শিকল দিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে বেশ শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছে!

দাশগুপ্ত এবং রবিকে এই ঘরে নিয়ে এসে গুণ্ডা তিনজন ঠিক ঐ একই প্রণালীতে দুটো খুঁটির সঙ্গে ওঁদের দুজনকে এমন করে বাঁধলো যে, নড়বার শক্তি আর রইলো না!

একাজ শেষ করে ওরা তিনজন আলো নিয়ে বেরিয়ে গেল! সঙ্গে সঙ্গে ঘরখানা সূচীভেদ্য অন্ধকারে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো!

এবার সুযোগ পেয়ে অচেনা বন্দী লোকটির উদ্দেশে ক্লান্ত-কণ্ঠে রবি প্রশ্ন করলো,—তুমি এখানে কতদিন আছো ভাই?

লোকটার কণ্ঠ শোনা গেল,—আমাকে বলছেন?

—হ্যাঁ। এখানে কতদিন আটক আছো?

—তা দিন পনেরো।

—অপরাধ ?

—অপরাধের কথা বলছেন ?···মানুষ খুন করতে রাজী হইনি, এই অপরাধ !

—অর্থাৎ ? ঠিক বুঝতে পারলাম না তোমার কথাটা ?—রবি বিস্ময়ে বললো।

—ব্যাপারটা তাহলে বলি, শুনুন।

—বলো ?

লোকটি শুরু করলো,—আমার নাম হরিদাস। আমার বাড়ি টালিগঞ্জে। স্পষ্ট কথাই বলছি···আমি নামজাদা ডাকাত !—খুন-খারাপিতে আমার হাত খুব চলে—মনে কখনো এতটুকু খট্‌কা লাগে না ! এই কারণেই দিন পনেরো-ষোল আগে একজন অচেনা লোক গিয়ে আমাকে বললো যে, আমাকে তারা পাঁচ হাজার টাকা দেবে বিনিময়ে চার-পাঁচজন মানুষকে আমায় খুন করতে হবে। একাজে আমি রাজী হলাম না। ফলে আমাকে আরও টাকার লোভ দেখানো হলো। কিন্তু কোটি টাকা দিলেও অহেতুক মানুষ খুন করতে রাজী নই, সেটা তাদের স্পষ্টই জানিয়ে দিলাম।

এই পর্যন্ত শুনে রবি প্রশ্ন করলো,—কেন, এত টাকার জন্য মানুষ খুন করতে তোমার অনিচ্ছা কেন হঠাৎ ?

হরিদাস বললো,—সে অনেক কথা, শুধু এইটুকু আপনাকে বলছি যে, আগে আমি যথেষ্ট খুন-খারাপি করেছি সত্য। কিন্তু বছর পাঁচেক হলো, বিশেষ এক কারণে আমি আগুন সাক্ষী করে প্রতিজ্ঞা করেছি, শুধু নিজেকে বাঁচাতে যদি মানুষ-খুন করার দরকার হয়, তবেই খুন

করবো, নচেৎ নয়—লাখো টাকা দিলেও না। তাই আমার এ দুর্গতি! ওদের কথা আমি শুনিনি বলে দলবল জুটিয়ে নিয়ে গিয়ে আমাকে ধরে এনে এখানে আটক করে রেখেছে! শুধু আটক নয়—আমার মৃত্যুদণ্ডেরও হুকুম হয়ে গেছে!

—মৃত্যুদণ্ড!—দাশগুপ্ত শিউরে উঠলেন।

—হ্যাঁ। এবং আগামী কাল সেই শুভদিন। ভোর হবার সঙ্গে-সঙ্গেই ওরা আমাকে মেরে ফেলবে!

—শুভদিন বলছো কেন?—রবি বেশ চমকিত হয়ে প্রশ্ন করলো।

—শুভদিন নয়? প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য মরছি, এ কম সৌভাগ্য নয়!···মানুষ যেমন মানুষকে সৃষ্টি করতে পারে না, তেমনি মানুষকে মারবার অধিকারও মানুষের নেই! এই সত্যটুকু হরিদাস বুঝতে পেরেছে বলেই হরিদাসের এই কঠিন প্রতিজ্ঞা।

আর কোন কথা না বলে রবি এবং দাশগুপ্ত নীরব রইলেন।

হঠাৎ বাইরের বারান্দা থেকে জুতোর মস্-মস্ শব্দ কানে এলো! শব্দ এগিয়ে আসছে। রবি অনুমান করলো, তাদের ঘরেই লোক আসছে।

অনুমান মিথ্যা হলো না! একজন ভদ্রবেশী লম্বা-চওড়া বলিষ্ঠ দেহ লোক তাদের ঘরে এলো। আর তার পিছনে পিছনে এলো একজন লাঠিধারী গুণ্ডা। তার এক হাতে লাঠি আর এক হাতে লণ্ঠন। ঘরে ঢুকে লণ্ঠনটা মেঝের এক পাশে রেখে সেখানেই স্থির হয়ে দাঁড়ালো। আর ভদ্রবেশী লোকটি এক পা এক পা করে সোজা এগিয়ে গেলো রবি এবং দাশগুপ্তের সামনে। রবির দিকে তাকিয়ে গম্ভীরকণ্ঠে সে বললো,—তোমাদের এখানে ধরে আনবার কোন

উদ্দেশ্য আমাদের ছিল না। তোমাদের সেই অনুপদার ওপরই ছিল আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু কার্ল সাহেবের ওখানে যাবার সময় মোটর পাল্টাপাল্টি করেছিল বলেই আমাদের উদ্দেশ্য ফেঁসে গেছে···যাই হোক এখন আমাদের অর্থাৎ অক্টোপাসের যা বক্তব্য, মন দিয়ে শোন। অক্টোপাসের হত্যা-প্রণালীর সঙ্গে আশা করি তোমাদের পরিচয় হয়েছে! তিনি নিঃশব্দে হত্যা করেন! এবং যাকে হত্যা করেন, সে নিজেও কিছু টের পায় না! অক্টোপাস যদি ইচ্ছা করতেন, তা হলে এতদিনে তোমাদের অনুপদাকে অনায়াসেই হত্যা করতে পারতেন, আশা করি এ বিশ্বাস তোমাদের হয়েছে। কিন্তু কেন তিনি তাকে হত্যা করছেন না, জানো? সে একজন মাথাওয়ালা লোক বলে। তার মত একটা লোক পৃথিবী থেকে সরে গেলে অনেক ক্ষতি হবে, এই ভেবেই তাকে খুন করতে ইতস্ততঃ! তোমাদের অনুপদা যদি এখনও না ক্ষান্ত হয়, অর্থাৎ অক্টোপাসকে গ্রেফ্‌তার করবার সংকল্প ত্যাগ যদি না করে, তা হলে তাকে তোমরা শত চেষ্টাতেও বাঁচাতে পারবে না। দু-তিনখানি পত্র দিয়ে সদ্ভাবে অক্টোপাস তাকে নিরস্ত হতে বলেছিলেন। কিন্তু তাঁর কথা সে গ্রাহ্য করেনি! বেশ বোঝা যাচ্ছে, অক্টোপাসের কথায় সে ক্ষান্ত হবে না। তবে অক্টো-পাসের বিশ্বাস, তোমরা যদি তাকে বুঝিয়ে বলো, তা হলে সে নিরস্ত হতে পারে।

রবি বললো,—না, তাতেও তিনি নিরস্ত হবেন না। সারা দুনিয়া যদি অনুরোধ করে অনুপদাকে, তবুও তিনি সে-অনুরোধ রাখবেন না।

লোকটি বললো,—তবুও একবার চেষ্টা করে ছাখো তোমরা।

—না, এ-কথা আমরা তাঁকে বলতো পারবো না। এমন কথা বলা অন্যায়!

—অবুঝ হয়ো না! যা বলছি, সে কথা মেনে চললে তোমাদের মঙ্গলই হবে!—লোকটার কণ্ঠ কঠিন হলো।

রবি নিরুত্তর।

রবিকে চুপ করে থাকতে দেখে সে আবার বললো,—কি, চুপ করে রইলে যে?

—আমাদের এক কথা!—রবির কণ্ঠ ইস্পাতের মতন কঠিন।

—কিন্তু জানো, এই মুহূর্তে তোমাদের সাফ্ করে দিতে পারি?

—জানি! এবং তা জেনেও এ কথা বলছি!

—বটে! এত স্পর্ধা! তা হলে মরতে তোমরা রাজী?

—হ্যাঁ, রাজী!

কথাটা বলেই রবি চকিতে তাকালো দাশগুপ্তের মুখের দিকে। দাশগুপ্তও তাকালেন রবির দিকে। মাত্র মুহূর্তেকের জন্যই দুজনের দৃষ্টি দুজনের ওপর নিবদ্ধ রইলো। তারপর দাশগুপ্ত লোকটির দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে স্থিরকণ্ঠে বললেন,—হ্যাঁ, আমরা রাজী আছি মরতে।

ক্ষণকাল চুপ করে থেকে লোকটি বললো,—এ তোমাদের উত্তেজনার কথা! বেশ ভাল করে ভেবে ছাখো!

—খুব ভালো করে ভেবে দেখেই বলছি! এখন তোমার যা খুশী, করতে পারো। রবি জবাব দিলো।

—বেশ, তাই হোক।

এই বলে লোকটি তার লাঠিয়াল সঙ্গীকে ইশারা করলো; সঙ্গে সঙ্গে লাঠি কাঁধে ঘর থেকে সে বেরিয়ে গেল। তার পুনরাবির্ভাব

হলো মিনিট পাঁচেক পরে। লাঠি ছাড়া এবার তার হাতে আর একটা যে জিনিস···সেটা দেখে রবি শিউরে উঠলো!···সিরিঞ্জ!···মরণের দূত···বিষে ভর্তি সিরিঞ্জটা চিক্‌চিক্ করে উঠলো!···আলো লেগে!

—কৈ, এনেছো? দাও।—ভদ্রবেশী চেয়ে নিলো সিরিঞ্জটা এবং বক্রদৃষ্টিতে রবির দিকে চেয়ে বললো,—কি হে টিক্‌টিকির বাচ্চা, দেখেছো?

মুখে তার অদ্ভুত একটুক্‌রো হাসি!

রবি বললো,—হ্যাঁ, দেখছি বৈকি। ওর মধ্যে বিষ আছে, তা-ও জানি।

—ওহো, তা-ও জানো বুঝি? এবার দেখবে, এ বিষের কাজ কি চমৎকার!—কী সুন্দর আরামের মৃত্যু নেমে আসবে এই বিষের মধ্যে থেকে!

কথাটা বলে লোকটা এগিয়ে গেল হরিদাসের কাছে, এবং সিরিঞ্জটা তার ডান হাতের বাহুর কাছে নিয়ে গিয়ে রবিদের উদ্দেশে বললো,—ভাল করে চেয়ে দেখো ওহে টিক্‌টিকি যুগল। বলেই সে সিরিঞ্জের ছুঁচটা হরিদাসের হাতে ফুটিয়ে খানিক বিষ ঢেলে দিলে!···

কোন যাতনা নেই—যন্ত্রণা নেই, এতটুকু হা-হুতাশ নেই!··· হরিদাসের মাথাটা মুহূর্তে ঝুঁকে পড়লো সামনের দিকে!···মৃত্যু!··· সুন্দর মৃত্যু!···বড় আরামের মৃত্যু!

দাশগুপ্ত আর রবি শিউরে ওঠে। মনে মনে ভাবে, এরা কি মানুষ? মানুষ হয়ে মানুষকে এভাবে খুন করা কি সম্ভব?

সিরিঞ্জটা হাতে নিয়ে লোকটা এবার রবির কাছে এগিয়ে এলো, বললো,—দেখলে, মানুষকে খুন করবার জন্য আমরা কতো সুন্দরতম

উপায় উদ্ভাবন করেছি! এখনও বলছি, ভেবে ছাখো! শুধু তোমার অনুপদাকে একটু বুঝিয়ে বলা। না হলে এই দণ্ডে···বুঝচো?

—আমি মরতে ভয় করি না!

—তবে মরো!

রবি দেখলো, সিরিঞ্জটা অস্বাভাবিক দ্রুত এগিয়ে আসছে তার হাতের দিকে! সে আর তাকাতে পারলো না,—চোখ বুজে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় রইলো। শেষবারের মত একবার মনে মনে বললো,—তোমার রবি চলে যাচ্ছে অনুপদা, তুমি এখনো এলে না?

দাশগুপ্তও আর চাইতে পারলেন না। 'মিস্টার গুপ্ত'—বলে একবার চীৎকার করে উঠেই চোখ বন্ধ করলেন।

সিরিঞ্জের ছুঁচ সবে রবির বাহু স্পর্শ করছে, সেই সঙ্গীন মুহূর্তে হঠাৎ একখানা বলিষ্ঠ হাত এসে লোকটার হাত থেকে সিরিঞ্জটা ছিনিয়ে নিলো, এবং সজোরে সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো ঘরের এক কোণে! চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল কাচের সিরিঞ্জটা!···রবির বন্ধ চোখ তখনি হলো উন্মুক্ত। চোখ খুলতেই আনন্দে চিৎকার করে উঠলো,—এসেছো অনুপদা!···শুনতে পেয়েছো আমার ডাক? তুমি কি ভগবান?

দাশগুপ্তও সানন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন,—সেন! ওঃ! আর এক সেকেণ্ড দেরি হলে সব শেষ হয়ে যেতো!

শান্তকণ্ঠে বললেন সেন,—হ্যাঁ, বুঝতে পারছি।

দাশগুপ্তের দুচোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে!

সহসা ভদ্রবেশী লোকটা সেনকে প্রবলভাবে একটা ধাক্কা মেরেই, ঘর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল! ধাক্কাটা সামলাতে না পেরে সেন ছিটকে পড়লেন মেঝের ওপর! লাঠিধারী গুণ্ডাটাও সঙ্গে সঙ্গে চম্পট!

বেশ চোট লেগেছে মাথায়। কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য দেবার অবসর কৈ? সেন উঠে দাঁড়ালেন।

আসামী দুজনে কিন্তু পরিত্রাণ পেলো না। ঘরের বাইরে অপেক্ষা করছিল চারজন কনস্টেবল্—তাদের হাতেই ধরা পড়ে গেল।

পূব-আকাশে ক্ষীণ আলো···

দিনের আগমন—রাত্রি বিদায় নিচ্ছে। ঠিক এই সন্ধিক্ষণে রবি, দাশগুপ্ত এবং আসামী দুজনকে নিয়ে সেন অক্টোপাসের বিবর ত্যাগ করলেন।

এগারো

মৃত্যুর দূত

একদিন পরের কথা।

সকাল সাড়ে সাতটা।

নিত্যকার মত সেন আর রবি দুজনে বৈঠকখানা ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন, এমন সময় একজন অপরিচিত ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে ইন্‌স্পেক্টর বিনয় মুখার্জী এসে উদয় হলেন। সেন তাঁকে সাদর আহ্বান জানিয়ে প্রশ্ন করলেন,—সঙ্গে উনি কে?

মুখার্জী নাটকীয় ভঙ্গীতে বললেন,—বলছি; জরুরী খবর।

মুখার্জী এবং ভদ্রলোক দুজনে দুটি চেয়ারে বসলেন।

সেন জিজ্ঞাসা করলেন,—আসামী দুজনের খবর কি? কোন কথা বের করতে পারলেন ওদের মুখ থেকে?

—নাঃ, পারলাম আর কৈ? অনেক কষ্ট দেওয়া হলো, কিন্তু শালাদের মুখ থেকে একটি 'রা-ও' বের করা গেলো না! অক্টোপাসের উপযুক্ত অনুচর বটে!

সেন চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন,—সত্যি, অক্টোপাস আমাদের শত্রু হলেও এটুকু বলতে লজ্জা নেই, তার মাথা আছে! এক্‌সেলেণ্ট্‌ ব্রেন!···কি বলেন?

—তা তো বটেই! সে সম্বন্ধে কোন মতভেদ থাকতে পারে না। আমি জীবনে এই প্রথম আসামী দেখলাম, অসাধারণ যার কৌশল, এবং মানুষ খুন করতে যে তিলমাত্র দ্বিধা বোধ করে না।···ক্রাইম নভেলেই এমন দুর্ধর্ষ মানুষের কথা পড়ি—বাস্তবে এমন! কল্পনার অতীত···স্বপ্নের অগোচর!···যাক, এদিককার ব্যাপার শুনুন। আমার বলবার দরকার হবে না, এই ভদ্রলোকই সব বলবেন। তবে আমি ভূমিকাচ্ছলে এইটুকু মাত্র বলে রাখছি, অক্টোপাস সম্বন্ধে আমরা যে ধারণা করেছিলাম, তা বিলকুল ঝুটা!

—বুঝলাম না!

—অর্থাৎ, অক্টোপাসের গতি একেবারে পালটে গেছে! অর্থাৎ যেভাবে সে চলছিল, এখন দেখা যাচ্ছে সে তার চলন-ভঙ্গি পরিবর্তন করেছে!

—বুঝলাম না।

—শুনুন। অক্টোপাস সম্বন্ধে আমরা প্রথমে ধারণা করেছিলাম, তার আক্রোশ শুধু মোটর-ব্যবসায়ীদের ওপর। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, তা নয়! এই ভদ্রলোকটির ভাই হচ্ছেন মস্ত একজন সোনার কারবারী। ভাইয়ের নাম জ্যোতিনাথ চট্টোপাধ্যায়। গতকাল

সন্ধ্যা সাতটার সময় জ্যোতিবাবু নিমন্ত্রণ যাবেন বলে নিজের মোটরে করে বাড়ি থেকে বেরোন। স্ত্রীকে তিনি বলে যান যে, রাত এগারোটার মধ্যে নিশ্চিত ফিরবেন। কিন্তু রাত একটাতেও তাঁকে ফিরতে না দেখে বাড়ির সকলে ভয়ানক ভাবনায় পড়েন! ভায়ের সন্ধানে নিমন্ত্রণ-বাড়িতে গিয়ে ইনি উপস্থিত হন। সেখানে গিয়ে শোনেন যে, এগারোটা বাজবার কিছু আগেই জ্যোতিবাবু সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছেন।

—তারপর ?—গম্ভীর মুখে প্রশ্ন করলেন সেন।

সঙ্গী ভদ্রলোকটির দিকে চেয়ে মুখার্জী বললেন,—বাকিটুকু আপনি বলুন মোহিতবাবু।

মোহিতবাবু ওরফে জ্যোতিবাবুর সহোদর বলতে লাগলেন,—সেখানে কোন রকম হৈ-হাঙ্গামা না করে আমি নিজের বাড়ি ফিরে এলাম। মনকে প্রবোধ দিলাম এই বলে যে, জ্যোতি হয়তো নিমন্ত্রণ-বাড়ি থেকে আর কোথাও গিয়েছে। এবং এই কথাই বাড়ির সকলকে বোঝালাম। তারপর নানারকম বিপদ-আপদের কথা ভাবতে ভাবতে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম। ঘুমোবার ইচ্ছা আমার মোটেই ছিল না। তবু চিন্তা করতে-করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, খেয়াল নেই!

ঘুম যখন ভাঙলো, তখনও ভালো ফর্সা হয়নি। জ্যোতি এসেছে কি না জানবার জন্য তাড়াতাড়ি আমি বিছানা থেকে উঠে পড়লাম। উঠে ঘরের আলো জেলে বাইরে যাবার জন্য দরজা খুলতেই ঘরের আলো গিয়ে পড়লো বারান্দার ওপর। আর সে আলোয় দেখি বারান্দার ওপর দরজার ঠিক সামনে পড়ে রয়েছে লাল রং এর ভাঁজ-

করা একটা কাগজ! কাগজখানা তাড়াতাড়ি তুলে ভাঁজ খুলে ফেললাম। খুলে বুঝলাম, একটা চিঠি। মাত্র দু তিন ছত্র তাতে লেখা। লেখা পড়ে আমি দুচোখে অন্ধকার দেখলাম!

—কি লেখা ছিল তাতে?—সেন প্রশ্ন করলেন।

মোহিতবাবু বললেন,—তাতে লেখা ছিল, 'শত চেষ্টা করলেও তোমার ভাইকে আর এ পৃথিবীতে খুঁজে পাবে না মোহিতবাবু। সে আর পৃথিবীতে নেই! আমার কৃপায় পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে সে স্বর্গধামে গিয়ে আস্তানা পেতেছে।' চিঠির নীচে নাম লেখা আছে 'অক্টোপাস'। চিঠিখানা পড়ে আমার অবস্থা যা হলো, আপনি বুঝতেই পারছেন অনুপবাবু!

—হুঁ। তারপর?

—তখনি আমি থানায় ছুটে যাই। থানার সকলেই শুনেছেন এ-কথা। তারপর ইনি আমাকে আপনার কাছে নিয়ে এলেন।

—বুঝেছি।

একটু চুপ করে থেকে সেন বললেন,—এ-সব কথা থানার লোক ছাড়া আর কাকেও বলেছেন?

—আজ্ঞে না। এমন কি বাড়িতেও কাউকে বলিনি।

—চিঠিখানা আপনার কাছে আছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আছে।

পকেট থেকে ভাঁজ-করা একটা লাল রংএর কাগজ বার করে তিনি সেনের দিকে এগিয়ে গেলেন, এবং পত্রখানি তাঁর হাতে দিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন।

চিঠির উপর চোখ বুলিয়েই সেন সহসা বজ্র-মুষ্টিতে মোহিতবাবুর

ডান হাতখানা চেপে ধরলেন, এবং হাসতে-হাসতে বলে উঠলেন—চমৎকার। চমৎকার মোহিতবাবু!

—কি হলো সেন?

বলে মুখার্জী শশব্যস্তে নিজের আসন ছেড়ে সেন এবং মোহিতবাবুর সামনে এসে দাঁড়ালেন।···রবিও দারুণ কৌতূহলে এগিয়ে এলো।

মুখার্জীর প্রশ্নের উত্তরে সেন হাসিমুখে বললেন,—খুব মজা, মুখার্জী! দেখবেন ব্যাপার?

এই বলে তিনি বাঁ হাত দিয়ে মোহিতবাবুর ডান-হাতের মুঠোর মধ্যে থেকে যে ছোট জিনিসটা টেনে বার করলেন, সেটি সামনের টেবিলে রেখে বললেন,—বলুন তো এটা কি?

প্রচণ্ড বিস্ময়ে মুখার্জী বলে উঠলেন,—ইন্‌জেক্‌শানের সিরিঞ্জ!

—হ্যাঁ। এই সিরিঞ্জের মধ্যে যে তরল পদার্থটুকু দেখছেন, সেটি বেশ কড়া বিষ!

—বিষ?

—হ্যাঁ, অতি সাংঘাতিক বিষ! যে-বিষে মৃত্যু হয়েছে প্রমথেশ-বাবুর—মৃত্যু হয়েছে দেবব্রতবাবুর—মৃত্যু হয়েছে কার্ল সাহেবের, এ সেই বিষ!···এই সাধুবেশী ভদ্রলোকটি এসেছিলেন আমাকে খুন করতে! কিন্তু পারলেন না!

ক্ষণকাল নীরব থেকে তিনি আবার বললেন,—মনে আছে মুখার্জী, অক্টোপাস আমাকে একদিন মৃত্যুদূতের ভয় দেখিয়েছিল?—এরাই হচ্ছে অক্টোপাসের সেই নিমকের গোলাম, মৃত্যুদূত!—

'মৃত্যুদূত' কথার রেশটুকু সম্পূর্ণ মিলিয়ে যেতে না যেতে সহসা মোহিতবাবু ওরফে অক্টোপাসের মৃত্যুদূত সবলে একটা ঝাঁকানি দিয়ে

সেনের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করলো, করেই বিদ্যুৎগতিতে অদৃশ্য হয়ে গেল ঘর থেকে।

এমন চকিত-চমক—যেন ম্যাজিক্। সেন প্রথমটা হতভম্ব হয়ে গেলেন। পর-মুহূর্তে উল্কার গতিতে মৃত্যুদূতের অনুসরণ করলেন।··· কিন্তু বৃথা সে অনুসরণ। তিনি যখন বাইরের বারান্দায় এলেন, তখন ধূসর রঙের একখানা মোটর মৃত্যুদূতকে নিয়ে ছুটতে শুরু করেছে।···

মুখার্জী এবং রবিও এলো বাইরে। মুখার্জীর দিকে চেয়ে সেন বললেন,—ধরে রাখতে পারলাম না মুখার্জী, এমন আচমকা ঝাঁকানি দিলে। আনন্দে আমি বড় বেশী মশগুল হয়ে পড়েছিলাম। ছি ছি। প্রতি পদে অক্টোপাসের কাছে আমাদের হারতে হচ্ছে। একেই বলে, পেয়ে নিধি হারালাম, বিধি হে!

মুখার্জী কোন কথা না বলে নীরব রইলেন। আর বলবেনই বা কি?—বলবার কিছুই ছিলো না তাঁর।

হতাশার নিশ্বাস ফেলে সেন বললেন,—চলুন, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই, ঘরে যাওয়া যাক।

তিনজনে ঘরে ফিরে আসন গ্রহণ করলেন। ক-মিনিট কারো মুখে কোন কথা নেই। পরে একসময় মুখার্জীর দিকে তাকিয়ে সেন বললেন,—যে মোটরখানায় ও পালালো, আপনি ঐ গাড়িতে ওর সঙ্গে এসেছিলেন?

মুখার্জী বললেন,—হ্যাঁ!

—গাড়িখানা আপনার নয়, নিশ্চয়?

—না, ওর গাড়ি।

—গাড়ির নম্বরটা লক্ষ্য করেছিলেন?

—না।

পাশ থেকে রবি বললো,—লক্ষ্য করলেও তাতে ফল হতো না অনুপদা। যে-নম্বর পেছনে এঁটে রেখেছে, সেটা আসল নম্বর নয় নিশ্চয় !

—তা ঠিক।—বলে সেন নীরব হলেন।

মুখার্জী বললেন,—কিন্তু আমি কি ভাবছি জানেন, সেন? ভাবছি কি ভয়ানক সাহস! এই দিনের বেলা আমাদের চোখের সামনে প্রকাশ্য ভাবে এসেছে আপনাকে খুন করতে!···ওঃ। এমন সাহসের কল্পনা করা যায় না!···

বারো

অক্টোপাসের জয়

কলকাতার প্রত্যেকটি নামকরা ইংরেজী, বাংলা সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় একযোগে বড় বড় হেড-লাইন দিয়ে এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ ছেপে বেরুলো।

দস্যু অক্টোপাসের বিরুদ্ধে ডিটেকটিভ্‌
অনুপ সেনের অভিযান
সাফল্যের আশা

বিশ্বস্ত সূত্রে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, বে-সরকারী ডিটেকটিভ্‌ অনুপ সেন এমন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহার দ্বারা নাকি অক্টোপাসকে খুঁজিয়া বাহির করা বা তাহাকে গ্রেফ্‌তার করা আদৌ

কষ্টকর হইবে না। এবং তিনি আশা করেন, দিন তিনেকের মধ্যেই অক্টোপাসকে তিনি গ্রেফ্তার করিতে সমর্থ হইবেন।

দুর্ধর্ষ দস্যু অক্টোপাসের কথা ইতিপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। অদ্যাবধি সে ছয়জন লোককে নির্মমভাবে হত্যা করিয়া সমগ্র কলিকাতায় ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছে। নিহত ব্যক্তি ছয় জনের মধ্যে তিনজন প্রসিদ্ধ মোটর-গাড়ি ব্যবসায়ী, এবং অপর তিনজন পুলিসের লোক। কাজেই এই দস্যুকে অচিরেই গ্রেফ্তার করা কতখানি প্রয়োজন তাহা সকলে বেশ উপলব্ধি করিতেছেন।

আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা অনুপ সেনের অভিযান যেন সার্থক হয়।

'যুগান্তর' থেকে এই খবরটি পড়ে ইন্স্পেক্টর রঞ্জন রায় প্রশ্ন করলেন সেনকে,—এ খবর ছেপে কি লাভ হলো মিস্টার সেন?

সেন বললেন,—লাভ হল এই যে অক্টোপাস আমাকে খুন করবার জন্য আজ রাত্রেই আমার এখানে এসে হানা দেবে। এবং তখন তাকে পাকড়াও করবো।

—কিন্তু সে যদি তার চরদের দিয়ে কাজ হাসিল করতে চায়?

—আমার বিশ্বাস, তা সে করবে না। সে নিজে আমার বাড়িতে আসবে। কেননা প্রতিক্ষেত্রে চরদের দিয়ে কাজ হাসিল করাতে গিয়ে ফল পায়নি। এ অনুমান সত্য কিনা, আজ রাত্রেই বোঝা যাবে। তবে হ্যাঁ, তাকে ধরবার ভার কিন্তু আপনাদের হাতে থাকবে। আমি শুধু আপনাদের হাতের মধ্যে তাকে তুলে দেবো।...এ সম্বন্ধে আজ বিকেলে বিশদভাবে পরামর্শ করা যাবে।

মুখার্জীও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন—অক্টোপাস লোকটি কে, কিছু ঠাহরকরতে পেরেছেন ?

মৃদু হেসে সেন বললেন,—পেরেছি !

—পেরেছেন !

রায় ও মুখার্জী বিস্ময়ে তাঁর পানে তাকালেন।

সেন বললেন,—পেরেছি। ইচ্ছা করলে এখনি গিয়ে তাকে গ্রেফ্তার করতে পারি। কিন্তু এখন তাকে দস্যু বা অক্টোপাস রূপে পাবো না—পাবো সাধারণ ভদ্রলোকের মূর্তিতে। সেভাবে তাকে গ্রেফ্তার করা আমার ইচ্ছা নয়।—আমার ইচ্ছা, তাকে দস্যু বা অক্টোপাসের খোলস সমেত ধরি। এই কারণেই আজ এই কৌশল করেছি। এ সংবাদ পড়ে কখনোই চুপ করে থাকতে পারবে না, সে আজই আসবে এখানে।

রায় বললেন,—অক্টোপাসের পরিচয় দিলে আপনার কাজের কোন অসুবিধা হবে ?

—না, না, অসুবিধা কি ? কিন্তু এত ব্যস্ত কেন ?—সময় হলেই সব জানতে পারবেন।

গোকুল চায়ের ট্রেতে করে চা, টোস্ট, ওমলেট নিয়ে হাজির হলো।

পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়ে রায় প্রশ্ন করলেন, আজ রাত্রেই তাহলে অক্টোপাসকে গ্রেফ্তার করা যাবে ?

সেন বললেন,—দেখুন, জোর করে কিছু বলতে চাই না। কেননা, দেবব্রতবাবুর বেলা সে যে কীর্তি দেখিয়েছে, তাতে জোর করে কিছু বলতে ভরসা হয় না। তবে এ-কথা ঠিক আজকের জয়-পরাজয়ের

ভার আপনাদের হাতে। আপনারা তাকে কায়দা করতে পারলেই···ব্যস্।

—কিন্তু কিভাবে কাজ হবে, কিছু বুঝতে পারছি না।

—ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? দাশগুপ্ত আর ঘোষকে নিয়ে বিকেলে আপনারা এখানে আসবেন। সকলের সামনে আমি বুঝিয়ে বলবো। কিন্তু খেয়াল রাখবেন অক্টোপাসের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার অর্থ প্রাণ হাতে নিয়ে খেলা! কাজেই খুব হুঁশিয়ার হয়ে কাজে নামতে হবে!

সেন চায়ের পেয়ালায় মুখ দিলেন।

পানাহার শেষ হলে রায় বললেন,—আচ্ছা, এবার তা হলে উঠি সেন। তারপর ঘড়িটা একবার দেখে নিয়ে বললেন,—আটটার মধ্যে আমাকে একবার আলিপুর যেতে হবে।

—তাহলে আসুন।

আর কিছু না বলে সেন, মুখার্জী আর রবিকে নমস্কার জানিয়ে রঞ্জন রায় প্রস্থান করলেন।

রাত আড়াইটে!···

অন্ধকারে সেনের নিঝুম বাড়িখানা কেমন যেন বিভীষিকায় ভরা! ···কেমন একটা থমথমে ভাব!···গা ছমছম করে!···

কোথাও এতটুকু শব্দ নেই। শব্দের মধ্যে কানে আসে শুধু একটা একঘেয়ে একটানা ঝিঁ-ই-ই শব্দ! রহস্যময় শব্দ। এ শব্দ কোথা থেকে আসছে, বা এর উৎপত্তি কি থেকে বোঝবার উপায় নেই।

ঘেউ···ঘেউ-উ-উ!···

আকাশ-বাতাস এবং নৈশ-স্তব্ধতা কাঁপিয়ে কোথায় একটা কুকুর

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো। তারপর কানে এলো একটা ঘুম-ভাঙা পাখীর 'কঁক কঁক' ডাক, আর তার ডানা নাড়ার ফট্‌ফট্‌ আওয়াজ।

তারপর আবার স্তব্ধতা।……বিভীষিকাভরা স্তব্ধতা…

পাঁচ মিনিট কাটলো। ঠিক পাঁচ মিনিট।

অতি নিঃশব্দে—নীরবতার গাম্ভীর্যকে এতটুকু ক্ষুণ্ণ না করে একখানা কালো রঙের ছোট মোটর এসে সেনের বাড়ির ফটকের ঠিক সামনে ফুটপাথের কোল ঘেঁষে দাঁড়ালো!

মোটরের দরজা ততোধিক নিঃশব্দে খুলে গেল!

আরোহী নামলো আরও সন্তর্পণে। দেখতে মানুষের মত, কিন্তু তাকে মানুষ বলা যায় না—যেন জীবন্ত বিভীষিকা!

চোখ দুটো এবং নাকটা ছাড়া মূর্তির সারা দেহ—মাথা থেকে পা পর্যন্ত কালো রঙের আঁট-সাঁট পোশাকে ঢাকা। আর তার ঠিক বুকের ওপর—কালো রঙের পোশাকে সাদা রঙ্‌ দিয়ে অক্টোপাস-এর মূর্তি আঁকা।

মূর্তিকে দেখে দ্বিতলে অপেক্ষারত সেন রবিকে অতি মৃদু সতর্ক কণ্ঠে বললেন,—অক্টোপাস এসেছে!

—কৈ?—বলে জানলার কাছে আসবামাত্র রবি অক্টোপাসকে দেখলো!

অক্টোপাস অতি-সন্তর্পণে দ্রুত ভিতরে ঢুকলো।

সেন বললেন,—খুব সাবধান, কোথা দিয়ে কি করে বসবে, ঠিক নেই!

অক্টোপাস ইতিমধ্যে বাড়ির ভিতর ঢুকেছে। কাজেই সেন বা রবি কেউ তাকে দেখতে পেলেন না।

সেন এবার জানলা বন্ধ করে ঘরের দরজা ঈষৎ ফাঁক করলেন, এবং অক্টোপাসের প্রতীক্ষায় দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে রইলেন নিশ্চল পাথরের মত !···

রবিও সোৎসুকে অনুপদার পিছনে দাঁড়ালো।

মিনিট খানেক পরে 'খুট্' করে মৃদু একটু শব্দ। সে শব্দ অনুসরণ করে সিঁড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করতেই ওঁরা দুজনে দেখলেন অক্টোপাসের ভয়াল ভয়ংকর মূর্তি !

অক্টোপাস ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে ওপরে ! তার ডান হাতের মুঠোয় পিস্তল, বাঁহাতে বিঘত-পরিমাণ একটি ইস্পাতের ধনুক, আর আঙুল ছয়েক লম্বা একটা তীর !—এমনি তীরে সে কার্ল সাহেবের প্রাণ নিয়েছে !···

সেন আর রবি যে-ঘরে, সিঁড়ি পার হয়ে বারান্দায় উঠে অক্টোপাস সেই ঘরের দিকেই আসছে। হাতের পিস্তল আরও শক্ত করে ধরেছে। —জ্বলন্ত চোখ দুটো আরও হিংস্র দেখাচ্ছে। প্রধান শত্রু সেনকে যেমন করে পারে, পৃথিবী থেকে আজ সে সরাবেই ! শুধু অক্টোপাস নয়—ছ আঙুল লম্বা তীরটাও যেন সেনের প্রাণ নেবার জন্য উন্মুখ উদগ্র হয়ে উঠছে ক্রমশ !···

অক্টোপাস আর সেন এঁদের দুজনের মধ্যে মাত্র আর হাত পাঁচ ছয় ব্যবধান। অক্টোপাস সেনের অস্তিত্ব এখনও টের পায়নি। কাজেই ঘরখানার দিকে সে একই ভাবে এগিয়ে আসতে লাগলো !···

আর চার হাত ব্যবধান !

আরো এক হাত এগুলো অক্টোপাস।

ব্যবধান তিন হাত।

সাক্ষাৎ মৃত্যুর মত এক-পা এক-পা করে অতি-সন্তর্পণে অক্টোপাস এগিয়ে আসছে ঘরের দিকে !···

আর দু হাত !

হঠাৎ সেন চিৎকার করে উঠলেন,—কে ?—কে আসে ? চিৎকারের পর-মুহূর্তেই তিনি রিভলভার বার করে দরজার ফাঁক দিয়ে পরপর দুবার ফাঁকা আওয়াজ করলেন।

অক্টোপাস মুহূর্তের জন্য বিমূঢ় হয়ে পড়লেও তখনি বিদ্যুৎ চমকের মত সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল এবং চক্ষের পলকে সেনের গৃহ ত্যাগ করে, আশ্রয় নিলো সে নিজের গাড়িতে। কিন্তু সে এ কল্পনাও করতে পারেনি যে, পিছনে সীটের আড়ালে দুজন পুলিস ইন্‌স্পেক্টর আত্মগোপন করে আছেন তারই প্রতীক্ষায়। গাড়ি থেকে নেমে সে যখন সেনের গৃহে প্রবেশ করে, তখন রায় আর মুখার্জী এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু অক্টোপাসের এ ছিল স্বপ্নেরও অগোচর !

তাই সে গাড়িতে এসে বসতেই রায় আর মুখার্জীর সুদৃঢ় বাহু-বন্ধনে আবদ্ধ হলো। ইত্যবসরে ঘোষ এবং দাশগুপ্তও এসে পড়লেন অন্য এক গুপ্ত জায়গা থেকে। তাঁরা এসে অক্টোপাসের হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন সেই পিস্তল আর তীর-ধনুক !

তারপর ?···

তারপর তাঁরা সকলে মিলে অক্টোপাসকে জাপটে ধরে সেনের ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। ঘর তখন উচ্চ পাওয়ারের বিজলী বাতি জ্বলছে।

অক্টোপাসকে দেখে গোয়েন্দা অনুপ সেন বললেন,—নমস্কার তারাচরণবাবু, বসুন।

প্রত্যেকের বিস্ময় সীমাহীন। মুখার্জী বললেন,—য়্যাঁ! তারাচরণবাবু?

হেসে বললেন সেন,—বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? এঁর মুখের ঢাকা খুলুন তাহলে বিশ্বাস হবে।

অক্টোপাসের মুখের আচ্ছাদন উন্মোচন করতেই তারাচরণবাবুর মূর্তি সুপ্রকাশ হলো।

সেন বললেন,—তারাচরণবাবুকে আপনারা আর মিছামিছি কষ্ট দেবেন না। ওঁকে চেয়ারে বসতে দিন।

সেনের কথায় সকলেই অক্টোপাস ওরফে তারাচরণবাবুকে বন্ধন থেকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু তারাচরণবাবু দাঁড়িয়ে রইলেন, বসলেন না।

—বসুন।—সেন অনুরোধ করলেন।

তাঁর এ অনুরোধ উপেক্ষা না করে তারাচরণবাবু চেয়ারে বসলেন।

সেন এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন। তারাচরণবাবুর হাত ছয়েক তফাতে সোফায় বসলেন; বসে বললেন,—আপনি বুদ্ধিমান্ এবং যথেষ্ট কৌশলী একথা অস্বীকার করি না তারাচরণবাবু। কিন্তু বুদ্ধিমান্ হয়েও এমন মারাত্মক ভুল আপনি করে বসলেন। আপনার জানা উচিত ছিল গোয়েন্দা বা পুলিস অপরাধীদের সম্বন্ধে কোন সূত্র বা তথ্য আবিষ্কার করলে বাইরের লোকের কাছে তা প্রকাশ করে না। কাজেই যে-সংবাদ পড়ে আপনি আমাকে খুন করবার জন্য ছুটে এসেছেন, সেটা পড়ে আপনার বোঝা উচিত ছিল, এর মধ্যে নিশ্চয় কোন রহস্য আছে। এ ধরনের খবর ছাপা হতে পারে না। অবশ্য আজ আমাকে খুন করতে না এলেও আপনাকে গ্রেফ্‌তার করতে

আমাকে বেগ পেতে হতো না!—কেননা, আপনি কে, তা অনেক আগেই বুঝতে পেরেছি।···যাক, এবার আপনাকে একটু কষ্ট দেবো।···যেমন রীতি বা দস্তুর!—এ পর্যন্ত বলে সেন ঘোষের দিকে তাকালেন।

একটা হাতকড়া হাতে নিয়ে ঘোষ খুশী মনে এগিয়ে গেলেন তারাচরণবাবুর দিকে। তিনি কাছে আসতেই তারাচরণবাবু হেসে উঠলেন।···পাগলের হাসি যেন···

হঠাৎ যেমন হেসে উঠলেন, তেমনি হঠাৎ আবার হাসি থামিয়ে গম্ভীর মুখে তিনি বললেন,—তোমার বুদ্ধির আমি তারিফ করি সেন! এবং ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি, তুমি কি সূত্র ধরে আমাকে আবিষ্কার করলে?···যাক্, যা হবার তা হয়েছে! কিন্তু তোমাকে জানাচ্ছি, যে আশা নিয়ে তুমি আমাকে গ্রেফ্‌তার করছো, সে আশা তোমার পূর্ণ হবে না।

কথাটা বলে তারাচরণবাবু ক্ষিপ্রহস্তে তাঁর পোশাকের মধ্য থেকে একটা ছোট সিরিঞ্জ টেনে বার করলেন। এবং সেনকে সেটা দেখিয়ে হাসতে হাসতে বললেন,—এটা কি, তা তুমি নিশ্চয় জানো! এটা হচ্ছে ইন্‌জেক্‌শন্ দেবার সিরিঞ্জ। আর এর মধ্যে যে পদার্থ দেখতে পাচ্ছো, সেটা ভয়কংর বিষ! কত ভয়ংকর, আশা করি, তোমার জানা আছে!···এখন এই বিষ যদি আমার নিজের দেহে ঢুকিয়ে দেই, তা হলে তোমাদের আশা পূর্ণ হবে কি সেন?···অক্টোপাসকে ফাঁসিকাঠে ঝোলানো এতোটা সহজ নয়!

তারাচরণবাবুর মনের ভাব বুঝতে পেরে সেন চিৎকার করে বলে উঠলেন,—তাড়াতাড়ি হাতকড়াটা হাতে এঁটে দিন ঘোষ! দেরি নয়!

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই তারাচরণবাবু সিরিঞ্জের ছুচটা ফুটিয়ে দিলেন নিজের বাঁ হাতে!···

তারপর?

তারপর তিনি কি করলেন, কি হলো, তা বোঝবার আগেই তাঁর দেহটা নুয়ে পড়লো চেয়ারের একধারে।

সেন ছুটে এলেন তারাচরণবাবুর পাশে। দেখেন, সব শেষ!··· চেয়ারের ওপর পড়ে আছে তারাচরণবাবুর দেহখানা···সে দেহে প্রাণ নেই!···

স্তম্ভিত সকলে! সকলের পলকহীন নেত্রে কি প্রচণ্ড বিস্ময়! কোথা দিয়ে কি হয়ে গেলো, তা বুঝবার অবসর কেউ পেলেন না! · যেন এক ভেল্‌কিবাজি ঘটে গেল চোখের সামনে!···

অসহায়ের মত করুণ হাসি হেসে রাজেন ঘোষের দিকে চেয়ে সেন বললেন,—অক্টোপাসকে ধরেও ধরতে পারলাম না ঘোষ! প্রতি পদে আমাদের পরাজয়!—এ পরাজয়ের গ্লানি কোন দিন ভুলতে পারবো না।

ঘোষ বললেন,—সত্যিই সেন, অক্টোপাস এক অসাধারণ শক্তি! কিন্তু আপনি যে কেমন করে অক্টোপাসকে আবিষ্কার করলেন, অর্থাৎ তারাচরণবাবু যে অক্টোপাস, এ আপনি কি সূত্রে আবিষ্কার করলেন, বুঝতে পারছিনে! ব্যাপারটা জানবার জন্য আগ্রহ হচ্ছে! যদি আপত্তি না থাকে···

সেন বললেন,—না আপত্তি কিসের?······শুনুন। এ রহস্য আমি খুব সহজভাবে সমাধান করতে পেরেছি ঘোষ।···প্রমথেশবাবু যেদিন মারা যান, সেদিন তাঁর মুখে একটা লজেঞ্জ আবিষ্কার করি। এবং পরীক্ষা করে বুঝি সেটা বিষ মাখানো!···এ থেকে আমি বুঝি প্রমথেশবাবু কোন আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবের হাতে খুন হয়েছেন। কেননা, আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধব ছাড়া তাঁকে লজেঞ্জ দেবে কে? বিশেষ করে বন্ধু-বান্ধবের ওপরেই আমার সন্দেহ হয় বেশি!

সেন বলতে লাগলেন,—তারপর প্রমথেশবাবুর ওখান থেকে বাড়ি ফিরতেই অক্টোপাসের চিঠি পেলাম। প্রমথেশবাবুর ব্যাপার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলে আমার নাকি সমূহ বিপদ, এ কথা বলে সে আমাকে ভয় দেখিয়েছে!···এসব ব্যাপার তো আপনারা প্রত্যেকেই জানেন।

যাই হোক, এবার আমার প্রধান চিন্তার বিষয় হয়ে ওঠে যে, প্রমথেশবাবুর আত্মীয়-স্বজন, এবং তাঁর নিজের সংসারের মধ্যে এমন কেউ আছে কিনা, প্রমথেশবাবুর মৃত্যুতে যার স্বার্থ আছে। চিন্তা করতে ওঁর বড় ছেলে সুব্রতর কথা মনে পড়ে যায়। কেননা, প্রমথেশবাবু কোন কারণে বছর চারেক আগে সুব্রতকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন, এবং তাকে সোজাসুজি বলে দিয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি উইল করে যাবেন ছোট ছেলে এবং মেজ ছেলের নামে। অবশ্য এই চার বছরের মধ্যেও তিনি কোন উইল করেননি। তাই আমার সন্দেহ হল, পাছে তিনি উইল করে ফেলেন, এই ভয়ে সুব্রত তাঁকে খুন করেছে। কারণ উইল করার আগেই যদি তাঁকে খুন করা যায়, তাহলে সম্পত্তিটা তার আর হাতছাড়া হবার আশঙ্কা থাকে না। এইজন্যই সুব্রতর ওপরই সর্বপ্রথম আমার সন্দেহটা গিয়ে পড়ে।

এর পরই পেলাম অক্টোপাসের আর একখানা চিঠি। দেবব্রত-বাবুকে হত্যা করবে বলে খবর জানিয়েছে। আমি বিব্রত হয়ে পড়লাম, দেবব্রতবাবুকে খুন করতে যাবে কেন সুব্রত?

এবার আর এক নতুন ভাবনা এলো মনে! প্রমথেশবাবু আর দেবব্রতবাবু দুজনেই মোটরব্যবসায়ী। কেবল মোটরব্যবসায়ীদের ওপরই আসামীর আক্রোশ দেখে আমার মনে ধারণা হলো, আসামী নিশ্চয় মোটরব্যবসায়ী! নিজের ব্যবসা চালু করবার জন্য সমব্যবসায়ীদের সংখ্যা কমাতে শুরু করেছে! এবং সে লোক প্রমথেশবাবুর বন্ধু-তুল্য নিশ্চয়ই! নচেৎ লজেঞ্জ খেতে দেবে কেন?

তারপর পনেরোই মার্চ।—দেবব্রতবাবুকে খুন করবার দিন!···

অক্টোপাস আমার রূপ ধরে নির্বিঘ্নে কাজ হাসিল করে গেল! ফলে আমার চেহারার সঙ্গে তার চেহারার যে কিছু মিল আছে, এটাও সে জানিয়ে দিয়ে গেল আমাকে! কিছু মিল না থাকলে অমন নিখুঁত ছদ্মবেশ ধারণ করা অসম্ভব!

আমার মনে প্রশ্ন জাগলো, আমার চেহারার সঙ্গে মিল আছে কোন ব্যক্তির?

এইটেই তখন আমার প্রধান চিন্তার বিষয় হলো! কিন্তু এজন্য বিশেষ বেগ পেতে হলো না। একটু চিন্তা করতেই তারাচরণবাবুর মুখখানা আমার চোখের ওপর ভেসে উঠলো!···মনে মনে মিলিয়ে দেখলাম, তিনি মোটরব্যবসায়ী বটে, এবং প্রমথেশবাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধুও বটে! বন্ধুত্বের খাতিরে তিনি প্রমথেশবাবুকে অনায়াসে একটা লজেঞ্জ খেতে দিতে পারেন!

তখন থেকে তারাচরণবাবুর উপর আমি লক্ষ্য রাখতে লাগলাম। একাজের জন্য আমি রবিকে নিযুক্ত করলাম। দিন কয়েক পরে রবির কাছ থেকে শুভসংবাদ পেলাম। কার্ল সাহেব যেদিন খুন হন, সেইদিনকার কথা। রবি এসে আমাকে খবর দিলো, তারাচরণবাবু একটা কালো রংএর পোশাকে সারা দেহ ঢেকে এইমাত্র বাড়ি থেকে বেরুলেন, এবং তাঁর সেই কালো পোশাকের বুকে অক্টোপাসের ছবি। বুঝতে দেরি হল না, অক্টোপাস হত্যালীলায় বেরিয়েছে। আমার এ অনুমান মিথ্যা হয় নি। কিছুক্ষণ পরে আপনার কাছ থেকে ফোনে খবর পেলাম কার্ল সাহেব অক্টোপাসের হাতে খুন হয়েছেন।

তারপর কার্ল সাহেবের ওখানে গিয়ে জগদীশের কাছ থেকে অক্টোপাসের চেহারার যে বর্ণনা পাই, আর এদিকে রবি তারাচরণবাবুর পোশাকের যে বর্ণনা দিয়েছিল দুয়ে মিললো। কাজেই তারাচরণবাবুই যে আসামী, এ সম্বন্ধে আমার আর সংশয় রইলো না! ইচ্ছা করলে

অনায়াসে যে কোন একদিন গিয়ে তারাচরণবাবুকে গ্রেফ্‌তার করতে পারতাম। কিন্তু তা না করে হাতে-নাতে ধরবো বলে এই প্ল্যানের আশ্রয় নিয়েছিলাম। কিন্তু এত কষ্টেও অক্টোপাসের জিত হলো!—তাকে গ্রেফ্‌তার করা গেল না!

—ঃ শেষ ঃ—